আমাজনের গহনে

অজেয় রায়

দুনিয়ায় কত জায়গাতেই তো যেতে ইচ্ছে করে। কিন্তু সাধ থাকলেই সাধ্যে, কুলোয় না। তাই মনে মনে বেড়াতে যেতে পারি এমন সুযোগ একমাত্র যাতে পাওয়া যায় তেমন বই পেলে আর কোনো দুঃখ থাকে না। কিন্তু তেমন বই কি সহজে মেলে? যাঁর কল্পনায় ভর করে যাব, তিনি হয়তো যেখানকার কথা বলছেন, সেখানে নিজে তো যান-ই নি, ভালো করে ঠিকমতো খবরাখবরও রাখবার চেষ্টা করেননি। তিনি হয়তো উত্তর মেরুতে পেঙ্গুইন পাখি দেখিয়ে ছাড়বেন আর দক্ষিণ মেরুতে শাদা ভাল্লুক।

তবে সে রকম বই যে বাংলায় মোটে নেই, তা কেউ যেন না বলে। এই তো আমার হাতে রয়েছে আমাজনের গহনে। যেমন তেমন জায়গায় নয়, সেই দক্ষিণ আমেরিকার উত্তরের অজানা পেরু আর বলিভিয়ার যে সব অঞ্চলে আমাজন নদীর সব ধারাপথ এখনো পুরোপুরি খুঁজে বার করা হয়নি, সেইখানে যদি যেতে হয় তো আমি অজেয় রায়ের সঙ্গেই যাব। উত্তেজনা রোমাঞ্চ গা-ছমছম করা ভয় আর রুদ্ধশ্বাস উদ্বেগের খোরাক তো পুরোপুরি পাবই, সেইসঙ্গে এইটুকু নিশ্চিত মানব যে প্রাকৃতিক ভৌগোলিক যা সব বিবরণ পাচ্ছি, তার মধ্যে এতটুকু ভুল কোথাও নেই। আমাদের ছোটদের মনগুলোকে সমস্ত পৃথিবীতে সার্থকভাবে ঘুরিয়ে আনবার জন্যে এই আমাজনের গহনের মতো বই আর অজেয় রায়ের মতো লেখকের বড় দরকার।

প্রেমেন্দ্র মিত্র

.

টোনি মার্কোর সঙ্গে আমাদের আলাপ হয় এক বিচিত্র পরিবেশে, আর সেই আলাপই হল এক রোমাঞ্চকর অ্যাডভেঞ্চারের সূত্রপাত।

দক্ষিণ আমেরিকার পেরু রাজ্য। বিশাল আন্ডিজ পর্বতমালার এক অংশ পড়েছে এই পেরুর মধ্যে। আন্ডিজের এক সুউচ্চ মালভূমিতে লুকনো প্রাচীন ইংকা জাতির এক নগরের ধ্বংসাবশেষ দেখতে গিয়েছিলাম আমরা তিনজন–আমি, সুনন্দ ও মামাবাবু। সঙ্গে ছিল আরও প্রায় জনা কুড়ি নানা দেশীয় ট্যুরিস্ট।

দুর্গম পথ, কিন্তু আশ্চর্য সুন্দর প্রাকৃতিক পরিবেশ। সরু ফিতের মতো রাস্তা বেয়ে আমাদের ছোট ট্রেন ঘুরে ঘুরে পাহাড়ে চড়েছে। মাঝখানে উরুবাম্বা নদীর গিরিখাত, তার ওপর লোহার ব্রিজ। ট্রেন থেকে নেমে পায়ে হেঁটে ব্রিজ পেরিয়ে ওপারে ট্যুরিস্ট বাসে উঠতে হয়েছে। হাজার ফুট তলায় উদ্দাম পাহাড়ি নদীর আস্ফালন দেখলে মাথা ঘুরে যায়।

এ সমস্তই রীতিমতো রোমহর্ষক অভিজ্ঞতা। কিন্তু এর পর পাহাড়ে চড়ে যা দেখলাম তাতে অভিভূত হয়ে গেলাম সবাই।

দূরে, যত দূরে চোখ যায় শুধু ঢেউয়ের মতো পর্বতমালা। আর সামনে পাহাড়-ঘেরা মালভূমির ওপর এক আশ্চর্য নগরীর কঙ্কালদেহ। উঁচু চওড়া প্রাচীর, বিস্তৃত সোপান

শ্রেণি, আর সারি সারি ছাদহীন কক্ষ সব পাথরে তৈরি। এই নির্জন মৃত প্রস্তরপুরী হচ্ছে ইংকাদের হারানো শহর ভিস্কাপম্পা যার আধুনিক নাম মাচুপিচু। আশ্চর্য জাতি এই ইংকারা; পাহাড়ের ওপর কী অদ্ভুত সব নগর গড়ে তুলেছিল। আমরা কুজকো শহরেও এমনি প্রকাণ্ড চৌকো পাথরের তৈরি প্রাচীন মন্দির প্রাসাদ ইত্যাদি দেখেছি, কিন্তু এমন খাড়া পাহাড়ের ওপর তাদের এই কীর্তি না দেখলে বিশ্বাসই হত না।

এক্সকিউজ মি।

মৃদু স্ত্রী-কণ্ঠ শুনে ফিরে দেখি এক প্রৌঢ়া মেমসাহেব। মাথায় পানামা হ্যাট, চোখে সানগ্লাস, হাতে একটি ক্যামেরা, পরনে সোয়েটার ও স্ল্যাকস। ভদ্রমহিলা হেসে বললেন, আপনারা কি এই সাইটটা নিয়ে আলোচনা করছেন?

আজ্ঞে হ্যাঁ। আমি জানাই। যদি দয়া করে ইংরেজিতে বলেন, আমিও শুনি। আমার পুরনো সভ্যতা সম্বন্ধে খুব আগ্রহ। আমার নাম মিসেস এমিলি জোন্স। বাড়ি ক্যালিফোর্নিয়া। আপনারা বোধহয় ভারতীয়?

ঠিক বলেছেন। আমি উত্তর দিলাম।

আমার সঙ্গে অনেক ভারতীয়ের চেনা আছে। একবার ইন্ডিয়া গিয়েছিলাম যে। মিসেস জোন্স উৎসাহিত হয়ে জানান।

বললাম, “আমরা ইংরেজিতেই আলোচনা করব। তাহলে আপনিও বুঝতে পারবেন। একটু গর্বের সঙ্গে সুনন্দর দিকে তাকালাম, যেন বোঝাবার দায়িত্বটা আমারই।

মিসেস জোন্স প্রশ্ন করলেন, আচ্ছা, এখানে থাকত কারা?

আমি উত্তর দিলাম, ইংকা রাজা ও রাজপরিবারের লোক, পুরোহিত এবং কিছু সৈন্য।

অ্যাঁ, তবে যে হোটেল ম্যানেজার আমায় বলল কুজকো ছিল ইংকাদের রাজধানী, মিসেস জোন্স সানগ্লাস খুলে আমায় কটমট করে দেখলেন। ভাবখানা যেন আমি ভুল বোঝাচ্ছি।

থতমত খেয়ে গেলাম। সুনন্দ মুখ লুকিয়ে হাসে। মামাবাবু উদ্ধার করলেন।–ম্যানেজার ঠিকই বলেছে। স্প্যানিয়ার্ডরা ষোলশো শতাব্দীতে পেরুর ইংকা সাম্রাজ্য এবং রাজধানী কুজকো অধিকার করে নেবার কিছু দিন পরে ইংকা রাজা মংকো সদলবলে পালিয়ে গিয়ে পাহাড়ের ওপর এই নগরে আশ্রয় নেয়। তারপর বলা যায় এটাই ছিল তাদের রাজধানী।

তারপর বুঝি স্প্যানিয়ার্ডরা মাচুপিচু দখল করে?

আজ্ঞে না। স্প্যানিয়ার্ডরা কোনোদিনই মাচুপিচুর সন্ধান পায়নি।

মিসেস জোন্স বললেন, তাহলে ইংকারা এখানে অনেক দিন রাজত্ব করেছিল বুঝি?

বেশি দিন নয়। মাত্র চল্লিশ বছর। ইংকারা মাঝে মাঝে পাহাড় থেকে নেমে এসে স্প্যানিয়ার্ডদের ওপর উৎপাত করত। শেষে একদল স্প্যানিয়ার্ড সৈন্য ইংকাদের দমন করতে পাহাড়ে চড়তে শুরু করল। তখন তরুণ টুপাক-আমারু ইংকাদের রাজা। সে ভয় পেয়ে মাচুপিচু ছেড়ে পাহাড়ের অন্য পাশে পালাতে চেষ্টা করে। স্প্যানিয়ার্ডরা তাদের তাড়া করল। ইংকারা পাহাড় থেকে নেমে বনের মধ্যে হাজির হল। সামনে আমাজনের অববাহিকার গভীর অরণ্য। রাজা আর এগোতে ভরসা পেল না। সন্ধি করার মতলবে সে স্প্যানিয়ার্ডদের হাতে ধরা দিল। কিন্তু স্প্যানিয়ার্ডরা তাদের কুজকোয় নিয়ে গিয়ে স্রেফ গর্দান নিল। ব্যস, ইংকা রাজবংশ ধ্বংস হল। স্প্যানিয়ার্ডরা পাহাড়ের ওপর কী আছে তা নিয়ে আর মাথা ঘামায়নি। ইংকাদের পবিত্র নগরী ভিলকাঁপাম্প বহুকালের জন্য হারিয়ে গেল।

আই সি! ভেরি ইন্টারেস্টিং। ভদ্রমহিলা মন্তব্য করলেন।

মিসেস জোন্স দেখেন, প্রশ্ন করেন, আর কেবল বলেন—'ভেরি ইন্টারেস্টিং!

আমি ও সুনন্দ বিরক্ত হচ্ছিলাম। ভদ্রমহিলা খুটখুট করে চলেছেন আর গুচ্ছের প্রশ্ন করে আমাদের সময় নষ্ট করছেন। আমি একটা মতলব আঁটলাম। বললাম, মামাবাবু, চলুন। ওই উঁচু পাঁচিলটার ওপর চড়ি। অনেক দূর দেখা যাবে।

মামাবাবু বুঝলেন। আমাদের দিকে আড়চোখে হেসে বললেন, বেশ চলো।

মিসেস জোন্স ঘাবড়ে গেলেন। এতটা বাড়াবাড়ি করার ইচ্ছে তার নেই। বললেন, অনেক ধন্যবাদ, এবার আমি বরং ফিরে গিয়ে রেস্ট নিই। অগত্যা তিনি ফিরে চললেন।

আর পরমুহূর্তেই পুরুষকণ্ঠে ইংরেজিতে কথা এল–যাক, মিসেস জোন্স-এর খপ্পর থেকে ছাড়া পেয়েছেন।

ফিরে দেখি এক শ্বেতাঙ্গ ভদ্রলোক। লালচে লম্বা চুল এবং প্রচুর দাড়ি-গোঁফের জঙ্গলে মুখ প্রায় ঢাকা। শুধু একজোড়া হাসিভরা ধূসর চোখ এবং তীক্ষ্ণ নাসিকা দেখা যাচ্ছে। উচ্চতা মাঝারি, তবে খুব জোয়ান বপু। বয়স মনে হল আমার চেয়ে কিছু বেশি। তার কাথে ঝলছে দুটো ক্যামেরা। লোকটি এগিয়ে এসে আমাদের সঙ্গে হ্যান্ডসেক করে বলল–আমার নাম টোনি মার্কো। পেশা ফোটোগ্রাফি। বাড়ি সুইজারল্যান্ড।

মামাবাবু পরিচয় দিলেন।–আমি নবগোপাল ঘোষ, এই হচ্ছে আমার ভাগনে সুপ বোস, আর এ সুনন্দের বন্ধু অসিত রায়। আমরা ভারতীয়। আমি লেকচার ট্যুরে এসেছি সাউথ

আমেরিকায়। এরা দুজনও সঙ্গে এসেছে। কাজ শেষ, হাতে সময় আছে, তাই দ্রষ্টব্য জায়গাগুলো ঘুরে দেখছি। তা মিসেস জোন্স-এর সঙ্গে আপনার আলাপ আছে নাকি?

আছে। অতি সামান্য। আসার পথে উনি আমাকে মাচুপিচু সম্বন্ধে এমন নানা জেরা শুরু করলেন যে বাধ্য হয়ে আপনাদের দেখিয়ে দিলাম। বললাম–ওঁরা খুব ভালো জানেন এ-বিষয়ে। যাক, এখন মাপ চেয়ে নিচ্ছি। কেমন লাগছে মাচুপিচু? আমি এ-জায়গার বড় ভক্ত। যতবার এদিকে এসেছি জায়গাটি দেখে গেছি?

আমি বললাম, আপনি সাউথ আমেরিকায় আরও এসেছেন নাকি?

–হ্যাঁ । দুবার।

–ছবি তুলতে এসেছেন? সুনন্দ জানতে চাইল।

হ্যাঁ। আমাজনের অরণ্যে ঢুকব আদিম উপজাতিদের ছবি তুলতে। গতবারও গিয়েছিলাম এই ধরনের ছবি তুলতে, কিন্তু নানা ঝাটে তাড়াতাড়ি ফিরতে হল! তাই আবার এসেছি।

মার্কোর সঙ্গে মাচুপিচু ঘুরে ঘুরে দেখলাম। সূর্যমন্দির, রাজপ্রাসাদ, পূজাবেদি। মার্কো। ভারি আলাপী ও রসিক ব্যক্তি। জানলাম কুজকোয় আমরা যে হোটেলে উঠেছি মার্কোও। সেই হোটেলে আছে। আমরা একসঙ্গে ফিরলাম।

পরদিন সকালবেলা। হোটেলের ঘরে বসে কফি খাচ্ছি, এমন সময় মার্কো এসে জুটলেন, সঙ্গে তার তোলা ছবির অ্যালবাম।

অপূর্ব রঙিন ফোটোগুলি। জঙ্গল, পশু-পাখি এবং ইন্ডিয়ান উপজাতির ছবি। ক্রিস্টোফার কলম্বাস আমেরিকা আবিষ্কারের পর এদেশকে ভুল করে ইন্ডিয়া, মানে ভারতবর্ষ ভেবেছিলেন। তাই আজও এখানকার আদিবাসীদের লোকে সংক্ষেপে ইন্ডিয়ান বলে ডাকে।

কতরকম উপজাতি। বিচিত্র তাদের সাজপোশাক। ছবি দেখলে বোঝা যায় কী গভীর জঙ্গলে ঢুকেছিল মার্কো। মার্কো বলল, সেবার আমার সঙ্গে ছিল ভিক্টর। ভিক্টর। আমেরিকান ছাত্র। শখ করে আমার সঙ্গে অ্যাডভেঞ্চারে বেরিয়েছিল। এবার ভিক্টর আসতেন পারেনি।

তারপর হঠাৎ মার্কো বলল, আচ্ছা, প্রোফেসর ঘোষ আপনার সঙ্গে কি কেনিয়ার ডেয়ারিং বিল-এর পরিচয় আছে?

মামাবাবু অবাক হয়ে বলেন, আছে। কেন?

মার্কো খুশি হয়ে বলে, "ঠিক। কাল থেকে ভাবছি কোথায় যেন দেখেছি আপনাকে। বিলের কাছে আপনার ফোটো দেখেছি। গল্প শুনেছি। ওঃ, আপনি তো বিখ্যাত প্রাণিবিজ্ঞানী।

প্রশ্ন করলাম, আপনার সঙ্গে বিলের আলাপ হল কোথায়? আফ্রিকায়?

হুঁ। দুজনে যে অনেক শিকার করেছি।

আপনি শিকার করতেন?

করতাম বইকি! রীতিমতো প্রফেসনাল হান্টার ছিলাম। কিন্তু পরে হলাম ক্যামেরা হান্টার। প্রাণী হত্যা আর ভালো লাগল না। তার চেয়ে ফোটো তোলা অনেক ইন্টারেস্টিং। যথেষ্ট সাহসের কাজও বটে। কারণ দূর থেকে গুলি ছোঁড়া নয়। খুব কাছে যেতে হয় ক্যামেরা বাগিয়ে।

অ্যালবামের পাতা উলটিয়ে যাচ্ছি, হঠাৎ মামাবাবু একটা ছবির ওপর ঝুঁকে পড়ে মন দিয়ে দেখতে লাগলেন। তিনজন উপজাতীয় লোকের ছবি। একজনের পোশাক বড় মজার। সেই বোধহয় প্রধান। কারণ সে দাঁড়িয়ে আছে মাঝখানে। তার হাতে তিরধনুক, আর মুখে। একগাল হাসি। কোমরে হাতে-বোনা সুতির খাটো কাপড়। খালি গায়ে নানারকম নশা। কিন্তু সেই সঙ্গে আবার মাথায় একটি শোলার গোল টুপি এবং গলায়

একখানা গিট দিয়ে বাঁধা নেকটাই। তার দুই সঙ্গীদের গায়ে অবশ্য কোনো আধুনিক সাজসজ্জা নেই।

মামাবাবু দেরাজ থেকে একটা ম্যাগনিফাইং গ্লাস বের করে কাঁচের মধ্যে দিয়ে ফোটোখানা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে লাগলেন। মার্কো হেসে বলল, "এখানকার গহন বনের অধিবাসীদের মধ্যে অনেক সময় এমনি অদ্ভুত পোশাক দেখা যায়। যারা এদের কাছে রবার বা পশুচর্ম কিনতে যায়, তাদের কাছ থেকে আদায় করে। কিংবা কোনো পর্যটকের কাছ। থেকে পায়। আমি দেখেছি স্রেফ নেংটির ওপর দামি একখানা টেরিলিনের শার্ট চড়িয়েছে কেউ কেউ।

মামাবাবু মুখ তুলে বললেন, এ ছবি কোথায় তুলেছেন?

আমি তুলিনি। তুলেছে ভিক্টর।

কোথায়?

হিথ নদীর তীরে। আমি কয়েকদিন পায়ের ব্যথায় কাবু হয়ে তাঁবুতে শুয়েছিলাম। ভিক্টর সেই সময় একা নৌকো নিয়ে অনেক ঘুরে আসে।

মাদ্রে দ্য দিওস নদীর সঙ্গম থেকে ও জায়গাটা কত দূর? মামাবাবু প্রশ্ন করলেন।

প্রায় একশো মাইল। এরা হিথ নদীর পাশেই থাকে। ইচোকাস ইন্ডিয়ান। এই লোকটা ওদের সর্দার।

আপনি কি ওই অঞ্চলে যাবেন এবার?

তাই তো ইচ্ছে আছে।

ছবি দেখা শেষ হল। মার্কো উঠল, ঘরে যাবে। মামাবাবু বললেন, মিঃ মার্কো, অরণ্য-যাত্রায় আমরা যদি আপনার সঙ্গী হই তাতে রাজি আছেন?

সে কি! মামাবাবুর এ আবার কী উদ্ভট খেয়াল! কী ভয়ঙ্কর জঙ্গল ছবিতে দেখেই বুঝেছি। সুনন্দর দিকে চাইলাম। সেও স্তম্ভিত। মার্কো আশ্চর্য হয়ে মামাবাবুর দিকে তাকিয়ে রইল।

মামাবাবু বললেন, "আমার খুব ইচ্ছে একবার আমাজনের অরণ্যে ঢুকব। ঠিক একা যেতে ভরসা হচ্ছিল না। অবশ্য আপনার যদি অসুবিধা না হয়।

মার্কো বলল, আমার আর কী অসুবিধা! একা যাচ্ছিলাম, আপনার মতো সঙ্গী পেলে সুবিধেই হবে। কিন্তু বড় কষ্টের জার্নি এবং খুব বিপজ্জনক বটে।

www.bengaliebook.com

মামাবাবু হাসলেন। আমাজন অববাহিকার অরণ্য যে কী বস্তু আমি তা জানি মিঃ মার্কো।

মার্কো উৎফুল্লভাবে বলল, হা হা, বিলের কাছে আপনাদের অনেক অভিযানের গল্প শুনেছি। উত্তম। চলুন তবে। ভাবছিলাম একা একা একঘেয়ে লাগবে, ভগবান সঙ্গী জুটিয়ে দিলেন। আপনারা তৈরি হোন। তিন-চার দিনের মধ্যেই আমি যাত্রা করব।

মার্কো বিদায় নেবার সঙ্গে সঙ্গে আমি ও সুনন্দ উত্তেজিতভাবে চেঁচিয়ে উঠলাম– মামাবাবু, কী ব্যাপার?

মামাবাবু শান্ত কণ্ঠে বললেন–ব্যাপার আছে।

বলছি। বিছানার ওপর আরাম করে পা গুটিয়ে বসে মামাবাবু বললেন–ডক্টর সত্যনাথ সর্বজ্ঞর নাম শুনেছ?

বললাম, “শুনেছি। বিখ্যাত উদ্ভিদবিজ্ঞানী। বাঙালি। মাস আষ্টেক আগে পেরু না বলিভিয়ার জঙ্গলে অভিযানে গিয়ে নিখোঁজ হয়েছেন। কাগজে লিখেছিল, খুব সম্ভব জলে ডুবে মৃত্যু। কিন্তু মৃতদেহ পাওয়া যায়নি।

মামাবাবু বললেন, অনেক কিছুই পাওয়া যায়নি। রীতিমতো রহস্যময় এই অন্তর্ধান। নদীর তীরে তার তাঁবু এবং কয়েকটা আজেবাজে জিনিস পড়ে থাকতে দেখা যায়। কিন্তু তার গবেষণা-সংক্রান্ত কাগজপত্র, বাক্স-ভরা স্পেসিমেন-সংগ্রহ এবং আরও অনেক নিজস্ব জিনিসের কোনো সন্ধান পাওয়া যায়নি। ডক্টর সর্বজ্ঞ তখন একটি মাত্র উপজাতীয় লোক সঙ্গে করে পেরুর লা-মন্টানা অঞ্চলে আদিম উপজাতিদের গ্রামে গ্রামে ভেষজ উদ্ভিদের সন্ধান করছিলেন। লা-মন্টানা হচ্ছে আন্ডিজ পর্বতের পূর্বে আমাজন অববাহিকার অরণ্য যেখানে শুরু হয়েছে তার নাম। এই অঞ্চলে অজস্র নদী, পাহাড় এবং গভীর বনভমি। জগতের খুব কম লোকই সেখানে গিয়েছে। মন্টানার বেশিরভাগ অংশ আজও অজানা। ঘুরতে ঘুরতে বৈজ্ঞানিক হঠাৎ নিখোঁজ হন। তার সঙ্গের লোকটিরও পাত্তা পাওয়া যায়নি। সমস্ত ব্যাপারটাই ধোঁয়াটে।

ওঁর খোঁজ করা হয়েছিল ভালো করে? আমি জিজ্ঞেস করলাম।

পেরু সরকারের উদ্যোগে এক অনুসন্ধানী দল দুর্ঘটনার জায়গায় গিয়ে কিছু খোঁজাখুঁজি করে। তারপর রিপোর্ট দেয়, সম্ভবত নদীতে ডুবে মৃত্যু ঘটেছে। জিনিসপত্র ভেঙে গেছে। দেহ কুমিরে খেয়ে ফেলেছে।

অর্থাৎ তুমি সর্বজ্ঞর সন্ধানে আমাজনের বনে যেতে চাও? সুনন্দ গম্ভীর মুখে বলল।

হ্যাঁ।

কিন্তু সার্চ-পার্টি কোনো খোঁজ পায়নি, তুমি কি পাবে?

এতদিন সেই ভেবেই কিছু করিনি। বললেন মামাবাবু। কিন্তু ওই ফোটোটা দেখে আমার আশা জেগেছে।

কোন ফোটো?

যে ফোটোটায় দেখলে একজন জংলি ইন্ডিয়ান হ্যাট আর টাই পরে রয়েছে, ওইটে।

তার মানে?

মামাবাবু বলতে লাগলেন, অদ্ভুত লোক এই সত্যনাথ সর্বজ্ঞ। অতি প্রতিভাবান বৈজ্ঞানিক, কিন্তু একেবারে ভবঘুরে টাইপ। কোথাও স্থির হয়ে বেশিদিন বাস করা ওঁর ধাতে ছিল না। একা একা দেশে দেশে ঘুরে বেড়াতেন নতুন উদ্ভিদের খোঁজে। দুনিয়ায় তার একমাত্র বন্ধন একটিমাত্র মেয়ে রূপা। রূপা কলকাতায় থেকে কলেজে পড়ে। বেচারা খামখেয়ালি বাবার জন্য সর্বদাই উদ্বিগ্ন। সর্বজ্ঞ এর আগেও এক্সপিডিশনে গিয়ে ভীষণ বিপদে পড়েছেন। সাময়িকভাবে নিখোঁজ হয়েছেন কয়েকবার। তবে এবারে আট মাস হয়ে গেল। তবু রূপার ধারণা, ওর বাবা ঠিক বেঁচে আছেন। হয়তো কোথাও গিয়ে আটকে পড়েছেন, তাই ফিরে আসতে পারছেন না।

রূপা দেবীর সঙ্গে তোমার দেখা হয়েছিল বুঝি? সুনন্দ প্রশ্ন করল।

হয়েছিল। রূপা নিজেই এসেছিল আমার কাছে। সর্বজ্ঞর সঙ্গে আমার সামান্য আলাপ ছিল। সেই সূত্রে রূপাকেও চিনি। আমি এদেশে যাচ্ছি শুনে রূপা দেখা করতে আসে। আমাকে ভালো করে ওর বাবার খোঁজ করতে বলে। নিখোঁজ হবার কিছুদিন আগে ডক্টর সর্বজ্ঞ তার মেয়েকে একটা চিঠি লেখেন। তাতে আভাস দেন যে, তিনি শিগগিরি এক দুরূহ অভিযানে যাবেন কোনো এক গোপন জায়গায়। চিঠির ভাষা আমার মনে আছে– এক অজ্ঞাত জায়গায় আবিষ্কারের সন্ধানে যাচ্ছি। কিছুদিন আমার খবর না পেলে চিন্তা কোরো না। তাই রূপা আজও আশা ছাড়েনি।

কিন্তু ওই ফোটোতে আপনি কী কু পেলেন? আমি অধৈর্যভাবে জিজ্ঞেস করলাম। কু-টা হল, ওই হ্যাট এবং টাই। ওগুলো খুব সম্ভব ডক্টর সর্বজ্ঞর। খেয়ালি মানুষ ডক্টর সর্বজ্ঞর আর এক খেয়াল ছিল সর্বদা ওইরকম হ্যাট আর ওই রকম লালের ওপর নীল ডোরাকাটা টাই ব্যবহার করা। আমি রূপার কাছ থেকে ডঃ সর্বজ্ঞর একটা ফোটো এনেছি। সেটা তিনি মেয়েকে চিঠির সঙ্গে পাঠিয়েছিলেন। তাতেও ঠিক ওই রকম হ্যাট ও টাই পরা।

শুধু তাই না, আমি বলব, ঠিক ওই হ্যাটটাই তিনি পরে রয়েছেন। কারণ ফোটোতে ডক্টর সর্বজ্ঞর টুপির সামনের দিকে একটা খাঁজকাটা ভাঙা চিহ্ন রয়েছে। আমি মিলিয়ে

দেখলাম সর্দারের টুপিতেও হুবহু ওই একই রকম খাঁজ রয়েছে। ওই টুপি আর টাই ইন্ডিয়ান সর্দার পেল কী করে, তাই আমি জানতে চাই।

খুব সোজা। সুনন্দ বলল। ডক্টর সর্বজ্ঞ সর্দারকে ওগুলো দিয়েছিলেন।

কিন্তু দেবে কীভাবে? সেটাই তো রহস্য। ডক্টর সর্বজ্ঞ যেখানে নিখোঁজ হন সেখান থেকে ওই সর্দারের বাস অন্তত ষাট-সত্তর মাইল দূরে।

সুনন্দ বলল, হতে পারে ডক্টর সর্বজ্ঞ নিরুদ্দেশ হবার আগে ওই জায়গায় গিয়েছিলেন। তখন সর্দার ওই হ্যাট আর টাই আদায় করে।

কিন্তু সেখানেও একটা প্রশ্ন থেকে যাচ্ছে, মামাবাবু বলেন, কারণ ডক্টর সর্বজ্ঞ মেয়েকে তার শেষ চিঠিতে লেখেন–অনেক দিন কোনো ফোটো পাঠাইনি বলে রাগ করেছিস। কী করব, ছিল না যে! এবারে তাই পাঠালাম। দেখ তোর বাবা কেমন দারুণ। পোজ দিয়েছে। অর্থাৎ মনে হয় ফোটোটা তোলা হয়েছিল চিঠিটা লেখার অল্প দিন আগে। চিঠিতে পেরুতে এক ছোট্ট শহর পুয়ার্টো ম্যালভোনাডোর পোস্টমার্ক। ওই শহরে ডক্টর সর্বজ্ঞ তাঁর শেষযাত্রার আগে কয়েকদিন কাটিয়েছিলেন...যাহোক, ওই হ্যাট-পরা সর্দারের দেখা পেলে এসব ধাঁধা পরিষ্কার হবে। জানা যাবে, কবে এবং কীভাবে ও হ্যাট-টাই পেয়েছে। আর তারপর হয়তো জানব ডক্টর সর্বজ্ঞর ভাগ্যে কী ঘটেছে।

শেষ চেষ্টা করলাম, “আচ্ছা মামাবাবু, এই ফোটোর ক্লু যদি অনুসন্ধান কমিটিকে জানিয়ে দেন?

মাথা নাড়লেন মামাবাবু।–কোনো লাভ নেই। একজন বিদেশির জন্যে ওরা খুব গা দিয়ে খুঁজেছে বলে মনে হয় না। তাদের এ বিষয়ে প্রশ্ন করে দেখেছি। বিরক্ত হয়। তাদের ধারণা, বৈজ্ঞানিক সর্বজ্ঞ আমাজনের বনে একা একা যখন ঘুরতে গেছেন তখন এমন দুর্ঘটনা তো হতেই পারে। ওই সরকারি কর্মচারীদের মতে, ডক্টর সর্বজ্ঞ একজন ছিটগ্রস্ত ব্যক্তি। নিখোঁজ হয়ে তাদের অযথা হয়রানি করেছেন। আমার বিশ্বাস, ক্লু-টা পেলে ওরা তো কিছু চেষ্টা করবেই না, উল্টে আমরা ওখানে যেতে চাইলে ভাববে ওদের ওপর টেক্কা দিচ্ছি। ফলে তারা বাধাও দিতে পারে। তার চেয়ে না জানানোই ভালো। লোকে জানুক বেড়াতে যাচ্ছি, ছবি তুলতে যাচ্ছি। হ্যাঁ, মার্কোকেও আমাদের মতলব এখন না বলাই উচিত। কী জানি যদি বেঁকে বসে?

.

০২.

কুজকো থেকে আমরা উড়োজাহাজে চেপে মাদ্রে দে দিওস নদীর পারে ছোট্ট শহর পুয়ার্টো ম্যালডোনাডোয় উপস্থিত হলাম। এখান থেকে লঞ্চে রওনা হব হিথ নদী দিয়ে।

মামাবাবু ও মার্কো ডক্টর কেন্ট নামে এক ব্যক্তির খোঁজ করতে শুরু করলেন। প্রকৃতপক্ষে এই কেন্টের সন্ধানেই আমাদের ম্যালডোনাডোয় আসা।

মামাবাবু বললেন, সার্চ-পার্টির রিপোর্টে আছে, ডক্টর সর্বজ্ঞ তাঁর নিরুদ্দেশ যাত্রার আগে এই লোকটির বাড়িতে কয়েক দিন থাকেন। আমি জানতে চাই সর্বজ্ঞ ডাক্তারকে কোনো গোপন জায়গায় যাত্রা সম্বন্ধে কিছু আভাস দিয়েছিলেন কিনা! মনে হয় দেননি। কারণ অনুসন্ধানী দল ডাক্তারের কাছে খোঁজখবর করেছিল। কিছু জানতে পারেনি। দেখা যাক চেষ্টা করে।

মার্কোর ইচ্ছে ডাক্তারের কাছে একজন ভালো মাঝির খোঁজ করবেন। সেই হবে গাইড। অচেনা গাইড নেওয়া বিপজ্জনক। এখানকার স্থানীয় রেড ইন্ডিয়ানরা খুব ভালো মাঝি, কিন্তু খামখেয়ালি। হঠাৎ তাদের মেজাজ বিগড়ে গেলে যাত্রীদের ফেলে পালাবে। সভ্য জগৎ থেকে বহু দূরে অজানা গভীর বনের মধ্যে তখন এক অসহায় অবস্থায় পড়তে হয়। গতবার মার্কো একবার এমনি বিপদে পড়েছিল। তাই ডাক্তারকে চাই।

মার্কো শুনেছে বিচিত্র লোক এই ডাক্তার। ডাক্তারি বিদ্যায় রীতিমতো সুনাম আছে, কিন্তু প্র্যাকটিসে মন নেই। অন্তত পয়সা রোজগারে উৎসাহ নেই। এই অখ্যাত জায়গায় পড়ে আছেন, প্রায়ই বনের ভিতর ঘুরে বেড়ান আর রেড ইন্ডিয়ানদের গ্রামে গ্রামে গিয়ে তাদের চিকিৎসা করেন। এ অঞ্চলের দরিদ্র অধিবাসীরা নাকি ডাক্তারকে ভীষণ শ্রদ্ধা করে। কেন্ট-এর নেশা নাকি অর্কিড ফুল। তিনি একজন জগদ্বিখ্যাত অর্কিড-বিশেষজ্ঞ।

একেবারে শহরের সীমানায় ডাক্তারের বাড়ি। ডাক্তারের বাড়ির গেটের সামনে এসেছি এমন সময় এক শ্বেতাঙ্গ ভদ্রলোক সাইকেল চেপে বাইরে থেকে এসে আমাদের দেখে নেমে পড়লেন। বেঁটেখাটো গোলগাল লোকটি, মাথাজোড়া টাক। মার্কো বলল, এটা কি ডাক্তার কেন্টের বাড়ি? আমরা তার সঙ্গে দেখা করতে চাই।

লোকটি কৌতূহলী চোখে চেয়ে বলল, "আমিই জর্জ কেন্ট। আপনারা?

মার্কো আমাদের পরিচয় দিল। ডাক্তার বললেন, চলুন ভিতরে।

প্রকাণ্ড কম্পাউন্ডওলা কাঠের তৈরি বাংলো ধরনের বাড়ি। চারপাশে বাগান, তাতে নানান ফল-ফুলের গাছ। সামনে বারান্দার ছাদে বুগেনভিলিয়ার লতা টকটকে লাল ফুলে ছেয়ে আছে। বারান্দায় উঠে বেতের চেয়ারে বসলাম। মার্কো তার আগমনের উদ্দেশ্য বলল। কেন্ট বললেন-আচ্ছা সে হবে। আপাতত কফি হোক। মেরি! মেরি!

ডাক্তারের স্ত্রী বেরিয়ে এলেন। ভারি স্নিগ্ধ চেহারা মহিলার। আলাপের পর হেসে বললেন, আপনাদের ডাক্তার যে এমন খ্যাতিমান ব্যক্তি হয়ে উঠেছেন জানতাম না। দেশবিদেশ থেকে সম্মানিত ভদ্রলোকরা সব আসছেন তার কাছে। যাক, ভালো ভালো। আমি তো ভাবি ও বুনো হয়ে গেছে।

একটু পরে এল কফি, স্যান্ডউইচ আর কাজুবাদাম ভাজা।

ডাক্তারের স্ত্রী জিজ্ঞাসা করলেন, এখানে উঠেছেন কোথায়?

বললাম, "ইচ্ছে আছে কোনো হোটেলে থাকব।

আরে ছি! ছি! এখানকার হোটেল অতি জঘন্য। আমাদের বাড়িতে থাকুন। আমরা খুব খুশি হব। ডাক্তারের ভদ্রতা-জ্ঞান নেই। এখনও পর্যন্ত এ-বিষয়ে কোনো খোঁজই নেয়নি।

ডাক্তার গম্ভীরভাবে বললেন, "দেখ মেরি, ওঁরা যে এখানে থাকবেন সে ডিসিশন আমি অলরেডি নিয়ে ফেলেছি। শুধু সুযোগ বুঝে কথাটাপাড়বার অপেক্ষায় ছিলাম। ডাক্তার ও মেরি কখনও ইংরেজি কখনও স্প্যানিশ ভাষায় কথা বলছিলেন। মেরি জাতিতে ইংরেজ। ডাক্তার স্কচ। তারা কয়েক পুরুষ এ দেশে আছেন।

এদেশের বেশিরভাগ লোক স্প্যানিশ ভাষায় কথা বলে, কারণ স্প্যানিয়ার্ডরাই প্রথম পেরুতে বসতি স্থাপন করে। এখানে আসার আগে মামাবাবুর নির্দেশে আমরা কিছু স্প্যানিশ ভাষায় তালিম নিয়েছিলাম, আর অভিযানে বেরুবার আগে মার্কো শিখিয়েছেন, এখানকার অধিবাসীদের প্রচলিত ভাষা টোপি, সামান্য কাজ চালাবার মতো। ফলে কথাবার্তা আমরা মোটামুটি বুঝতে পারছিলাম।

কথার ফাঁকে ডাক্তার মামাবাবুকে প্রশ্ন করলেন, আপনারা ইন্ডিয়ার কোন অংশের লোক?

ইন্ডিয়া এবং ক্যালকাটা শুনে একটু থমকে গিয়ে বললেন, কী আশ্চর্য! আর একজন ক্যালকাটার লোকের সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছে। সায়ান্টিস্ট সর্বজ্ঞ। চেনেন তাকে?

মামাবাবুর চোখ চকচক করে উঠল। বললেন, চিনি, তবে সামান্য। আচ্ছা, সবজ্ঞর নিরুদ্দেশ হওয়ার ব্যাপারটা কেমন রহস্যজনক নয় কি? না পাওয়া গেল দেহ, না পাওয়া গেল তার জিনিসপত্র। এমনও হতে পারে বৈজ্ঞানিক কোথাও আটকে পড়েছেন। বন্দী বা। অসুস্থ হয়ে আছেন। ফিরে আসতে পারছেন না।

হুঁ। হতে পারে। ডাক্তার মাথা নাড়েন। আমি একবার নিরুদ্দেশ হয়েছিলাম মেক্সিকোয়। মেরি তিন মাস আমার কোনো খবর পায়নি।

আচ্ছা, সর্বজ্ঞ ম্যালডোনাডো ছাড়বার আগে উনি কোথায় যাচ্ছেন সে-বিষয়ে আপনাকে কিছু বলেছিলেন?

না।

সংক্ষিপ্ত উত্তর। মনে হল যে এ-বিষয়ে আলোচনা করতে ডাক্তার অনিচ্ছুক। হয়তো তাকে অনেক জেরা করা হয়েছে, তাই এ-ব্যাপারে তার বিরক্তি জন্মেছে।

মার্কো ছবি তুলতে লেগে গেল। রক্তবর্ণ বুগেনভিলিয়ার ঝাড় ব্যাকগ্রাউন্ডে রেখে মেরির ফোটো তুলল। মামাবাবু বললেন, একটা কথা মনে পড়ল। আমি সাউথ আমেরিকায় আসার আগে বৈজ্ঞানিক সর্বজ্ঞর মেয়ে আমার সঙ্গে দেখা করে। দুর্ঘটনার কিছুদিন আগে সর্বজ্ঞ মেয়েকে তার একখানা ফোটো পাঠিয়েছিলেন। ওঁর মেয়ে বলেছে, ফোটোতে সর্বজ্ঞ মাথায় শোলার হ্যাট ও লাল নেকটাই পরেছিলেন। গায়ে নেভি-বু শার্ট। ফোটোটা মেয়ে হারিয়ে ফেলেছে। ওই ফোটোর আরও কপি সে চায়। আমায় জোগাড় করে নিয়ে যেতে বলেছে। একমাত্র মেয়ে। বড্ড ভেঙে পড়েছে। আচ্ছা এখানে সর্বজ্ঞ কি কোনো ফোটো তুলেছিলেন? তুললে, কে তুলেছেন সেটা জানেন?

ডাক্তার বলল, “আমি স্বয়ং ওই ফোটো তুলি। দেব আপনাকে এক কপি। ফেরার সময় নিয়ে যাবেন।

মেরি আক্ষেপের সুরে বললেন, বৈজ্ঞানিক তার মেয়েকে খুব ভালোবাসতেন, জানি। কী চমৎকার লোক ছিলেন! অত বড় পণ্ডিত, অথচ কোনো অহঙ্কার নেই। ইস, কী কাণ্ড যে হয়ে গেল!

আমি সুনন্দর দিকে অর্থপূর্ণভাবে চাইলাম। অর্থাৎ মামাবাবুর অনুমান ঠিক। যেখানে দুর্ঘটনা ঘটেছে বলে মনে করা হচ্ছে বৈজ্ঞানিক সর্বজ্ঞ তার চেয়ে অনেক দূরে গিয়েছিলেন। নইলে তাঁর টুপি আর টাই ওই সর্দার পেল কী করে?

মামাবাবু নির্বিকার। বললেন, মিসেস কেন্ট, ফেরার সময় দয়া করে ছবিটার কথা আমায় মনে করিয়ে দেবেন। নইলে লজ্জায় পড়ব রূপার কাছে।

কথায় কথায় মামাবাবু ডাক্তারকে বললেন, শুনেছি আপনি রেড-ইন্ডিয়ান উপজাতিদের গ্রামে গ্রামে গিয়ে তাদের চিকিৎসা করেন?

ডাক্তার বললেন, হ্যাঁ করি। কারণ সরল আদিবাসীদের আমি ভালোবাসি। আর আমি মনে করি, এটা আমার কর্তব্য। আমার শ্বেতাঙ্গ পূর্বপুরুষরা এখানকার আদিবাসীদের অনেক অত্যাচার করেছে। তাদের ক্রীতদাস করে, পশুর মতো ব্যবহার করেছে। আমি কলঙ্ক মুছে ফেলার চেষ্টা করছি। অনেকে আমায় পাগল বলে। বলুকগে। আমি নিজে কী ভাবি জানেন? ইংকা। আমার দেহে ইংকা-রক্ত আছে। আমার ঠাকুরমা ছিলেন ইংকা-রমণী। অমন সুসভ্য জাতির লোক হওয়া আমি গৌরবের বিষয় মনে করি। স্প্যানিয়ার্ডরা অস্ত্রের জোরে এক বিরাট সভ্যতাকে ধ্বংস করে ফেলেছিল। ইংকাদের বহু জ্ঞানভাণ্ডার হারিয়ে গেল। শ্বেতাঙ্গরা যদি সেসব বিদ্যা শিখে নিত তবে মানুষের অনেক অনেক উপকারে লাগত।

ডাক্তার বেশ উত্তেজিত হয়ে উঠেছিলেন। হঠাৎ অতিথিদের সামনে বক্তৃতা দেবার লজ্জায় চুপ মেরে গেলেন। আমাদের কিন্তু এই আদর্শবাদী মানুষটির ওপর বড় শ্রদ্ধা জাগল।

সেদিন বিকেলে এক অদ্ভুত অভিজ্ঞতা হল।

মার্কো আর মামাবাবু শহরে গেছেন। সুনন্দ একটা বইয়ে ডুব দিয়েছে। ডাক্তারকে দেখছি না। মিসেস কেন্ট রান্নাঘরে ব্যস্ত। আমি বেরিয়ে পড়লাম বাগানটা এক ঘুরে দেখতে।

অনেকটা জায়গা জুড়ে ডাক্তার কেন্টের বাগান। ফুল-ফলের গাছগুলি কিছু চেনা, কিছু অচেনা। কয়েকজন দেশি মালি কাজ করছিল বাগানে। একধারে পরপর কয়েকটা তামেন জালে তৈরি ঘর। জালে লতা উঠে ছেয়ে গেছে। কোনো ঘরে বাঁশের কঞ্চির বেড়ায় তৈরি দেওয়াল বা ছাদ। কাছে গিয়ে বুঝলাম গ্রিনহাউস। যার মধ্যে আলো, বাতাস, উত্তাপকে নিয়ন্ত্রণ করে নানারকম ফুলগাছ রাখা হয়। প্রথম ঘরের দরজা একটু ফাঁক। ভিতরে ডাক দিলাম। সবই অর্কিড গাছ। ছাদ থেকে তারে বাঁধা কাঠ বা শুকনো গাছের ডাল আঁকড়ে ঝুলছে নানা জাতের অর্কিড। কয়েকটা গাছসুদ্ধ টব ঝোলানো রয়েছে ছাদ থেকে। শুনেছি এই ধরনের বায়বীয় অর্কিড বৃষ্টির জল, রোদ, হাওয়া থেকে খাদ্য গ্রহণ করে। মাটিতে টবে কিছু গাছ রয়েছে। ফুল ফুটেছে কোনোটায়। ভালো করে দেখতে ভিতরে ঢুকলাম।

পিছনে পায়ের শব্দ। ফিরে দেখি দরজার মুখে দাঁড়িয়ে আছেন ডাক্তার কেন্ট। থমথমে মুখ। রুক্ষ গলায় প্রশ্ন করলেন, কী করছেন এখানে?

উত্তর দিলাম, এই দেখছিলাম, কত রকম অর্কিড?

রীতিমতো আদেশের সুরে ডাক্তার বললেন, এখন যান। পরে আমি দেখিয়ে দেব।

অপ্রস্তুত হয়ে বাংলোয় ফিরলাম। এ-ঘটনা বললাম না কাউকে।

.

০৩.

পরদিন সকালে দেখলাম ডাক্তারের আবার দিব্যি হাসিখুশি মেজাজ। আমাদের আমন্ত্রণ জানালেন, চলুন অর্কিড দেখবেন।

গ্রিন-হাউসের দিকে যেতে যেতে বললেন, অর্কিড আমার নেশা। মেরি রাগ করে। বলে, বৃথা সময় আর অর্থ ব্যয় হচ্ছে। আবার নতুন কোনো ফুল ফুটলে যখন ডেকে দেখাই, তখন রাগ ভুলে যায়। অর্কিড গাছে বড় যত্ন লাগে। ফুল ফুটতে অনেক সময় নেয়। সাত-আট বছরও লেগে যায়। তবে হ্যাঁ, একবার ফুটলে সে-ফুল থাকে অনেক দিন। দু-তিন সপ্তাহ থেকে তিন-চার মাসও কোনো কোনো ফুল গাছে তাজা থাকে। তখন মনে হয় পরিশ্রম সার্থক।

সুনন্দ প্রশ্ন করল, অর্কিড ফুলের বিশেষত্ব কী?

মামাবাবু বললেন, প্রধানত ফুলের গড়ন। ফুলের একটি পাপড়ির গড়ন অন্য ফলের চেয়ে আলাদা হয়। একটু বড় হয় সাধারণত।

ডাক্তার বললেন, “আমি সাধারণত দক্ষিণ আমেরিকার ট্রপিকাল অঞ্চলে যত বকা অর্কিড পাওয়া যায় তাই জোগাড় করি। অবশ্য অন্য দেশের অর্কিডও আছে।

একটা গ্রিন-হাউসের ভিতর ঢুকে ডাক্তার ঘোষণা করলেন, এর মধ্যে আছে প্রধানত ক্যাটলিয়া প্রজাতীয় অর্কিড। এদের আদি বাস মধ্য আমেরিকা এবং দক্ষিণ আমেরিকার উত্তর অংশে।

ডাক্তার গাছগুলির কখনও ল্যাটিন নাম কখনও বা চলতি নাম বলতে লাগলেন।–ওই ছোট ছোট লাল ফলগুলি মিলটোনিয়া। ওই যে সাদা ফুল, মধ্যিখানে গোলাপি হলুদ মেশানো একটি পাপড়ি, ওটি ব্রাজিলের ক্যাটলিয়া ট্রিয়ানাল।

ওইসব নাম-গোত্র আমার মাথায় ঢুকছিল না।

ক্রমে গ্রিন-হাউস দেখা শেষ হল। আমার মনটা খচখচ করছে। কাল একটা অর্কিড দেখেছিলাম, সেটা আজ আর নেই। কোথায় গেল? দেখছি না তো! খোলা বাগানেও কি

অর্কিড গাছ রয়েছে। গাছের ডালে ঝুলছে, মাটিতে জন্মেছে। একটা লতা দেখিয়ে ডাক্তার বললেন, এই হচ্ছে ভ্যানিলা লতা। এও একরকম অর্কিড।

ঝাঁকড়া লতা একটা বড় গাছে পাকিয়ে পাকিয়ে উঠেছে। তাতে শিমের মতো ফল। চ্যাটাল সবুজ পাতা, আর হালকা সবুজ ফুল।

যে ভ্যানিলা আইসক্রিম বা চকোলেটে দেয়? আমি আশ্চর্য হয়ে বলি।

ডাক্তার বললেন, হ্যাঁ। ওই ফলের বীচি থেকে ভ্যানিলার গন্ধ তৈরি হয়। ভ্যানিলা কিন্তু আধুনিক মানুষের আবিষ্কার নয়, পাঁচশো বছর আগে মেক্সিকোর আজটো চকোলেটে ভ্যানিলা মিশিয়ে খেত।

একটার দিকে আঙুল দেখিয়ে ডাক্তার বললেন, এই অর্কিড আমার সৃষ্টি। চার রকম অর্কিডের মিশ্রণে এটা তৈরি। এরকম আরও কটা নতুন ফুল আমি তৈরি করতে পেরেছি।

একটু গর্বের সঙ্গে বললেন ডাক্তার, তাছাড়া পাঁচ রকম নতুন অর্কিড আমি আবিষ্কার করেছি, কুড়ি বছর দুর্গম পাহাড়-জঙ্গলে ঘুরে বেরিয়ে।

কুড়ি বছরে মাত্র পাঁচ! সুনন্দ অবাক হয়ে প্রশ্ন করে।

ডাক্তার বললেন, আমি তো সৌভাগ্যবান। অনেকে সারা জীবনে একটাও নতুন অর্কিড আবিষ্কার করতে পারে না।

ঘণ্টা দুই পরে ফিরলাম।

সুযোগ পাওয়া মাত্র মামাবাবুকে জানালাম, কাল একটা ফুল দেখেছিলাম, সেটা আজ আর কোথাও দেখলাম না। একটু আশ্চর্য লাগছে।

কাল? মানে?

মামাবাবুকে গতকালের ঘটনাটা খুলে বললাম। ডাক্তার কেন্টের অদ্ভুত ব্যবহারের কথাটাও বাদ দিলাম না। বললাম, চমৎকার ফুলটা। ঢুকেই আমার চোখে পড়েছিল। গাঢ় নীলরঙা পাপড়িগুলি। মাঝের একটা পাপড়ি শিঙার মতো মাথা উঁচু করে রয়েছে, তার গায়ে গোলাপি আভা। আজ সেটা সরিয়ে ফেলা হয়েছে। কোনো গ্রিন-হাউসে নেই।

মামাবাবু ভুরু কুঁচকে বললেন, রঙ ঠিক মনে আছে?

হুঁ আছে। গন্ধও মনে আছে। চমৎকার মিষ্টি সুবাস।

সুনন্দ বলল, কোণের গ্রিনহাউসটা তালা মারা ছিল। আমরা ঢুকিনি। সেটায় রাখা হয়েছে হয়তো।

মামাবাব গম্ভীরভাবে বললেন, আজ সন্ধেবেলা সেটা জানার চেষ্টা করব। অসিত কাউকে বোলো না কিছু এ-বিষয়ে।

ব্যাপারটা মামাবাবু এত সিরিয়াসলি নেবেন ভাবিনি।

সন্ধ্যার অন্ধকার নামতেই মামাবাবু হুকুম দিলেন–চলো। ডাক্তার রুগী দেখতে বেরিয়েছেন, মার্কো ক্যামেরা নিয়ে খুটখাট করছে। এই সুযোগ।

হালকা জ্যোৎস্না ফুটেছে। দূরে মালিদের কুটিরের সামনে আগুন জ্বেলে রান্না হচ্ছে। আমরা ধীরে ধীরে সেই বন্ধ গ্রিনহাউসের সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম। মামাবাবু জালের ভিতর দিয়ে টর্চের আলো ফেললেন ভিতরে। ওই তো সেই গাছ! সেই নীল ফুল। আমি উত্তেজিতভাবে দেখাই।

মামাবাবু প্রায় আধ মিনিট ফুলটা লক্ষ করলেন। তারপর চিন্তিতভাবে বাড়ির দিকে ফিরে চললেন।

আমরা দুজনও তার পাশাপাশি চলেছি, হঠাৎ অন্ধকারে বিদ্যুতের মতো কী এক প্রাণী লাফিয়ে পড়ল সামনে। সঙ্গে সঙ্গে টর্চ ফেলে ভয়ে কাঠ হয়ে গেলাম। একটা জাগুয়ার। প্রকাণ্ড আকার। হলদের ওপর কালো ছোপ ছোপ, দেহটা টান টান। ওৎ পেতে বসে দন্ত বিকশিত করে গরগর করছে আমাদের দিকে চেয়ে। তার লেজ অল্প অল্প নড়ছে, সবুজ চোখ দুটো জ্বলছে হিংস্র রাগে।

এবার দেবে লাফ। আমার গলা শুকিয়ে এসেছে, বুকের ভেতর হাতুড়ি পিটছে। কিন্তু বাঘটা দেরি করছে কেন? সহসা কানে এল ডাক্তারের গলা–মাংকো।

অমনি বাঘটা পিছন ফিরে দেখল একবার। পরমুহূর্তে দীর্ঘ লাফে অদৃশ্য হয়ে ঝোঁপের আড়ালে।

দৌড়ে এলেন ডাক্তার। একি, অন্ধকারে বেরিয়েছেন কেন? খুব ভয় পেয়েছেন তো?

মামাবাবু প্রথম কথা বললেন, ওটা কি আপনার পোষা বাঘ?

হ্যাঁ, আক্রমণ করে না কাউকে। তবে অচেনা মানুষ দেখলে ভয় দেখায়। দিনেও ছাড়া থাকে। আপনারা আছেন বলে শুধু রাতে ছাড়ছি। আমার বলে রাখা উচিত ছিল।

বুক ধড়ফড়ানি কমতে বেশ কিছুটা সময় নিল। আজকের ঘটনার পর ডক্টর কেন্টকে আরও রহস্যময় বলে মনে হচ্ছে।

পরদিন আমরা ম্যালডোনাডো ছাড়লাম। লঞ্চে মামাবাবু আমাদের দুজনকে আড়ালে বললেন, ওই নীল অর্কিড বড় ভাবিয়ে তুলল যে!

কেন?

বৈজ্ঞানিক সর্বজ্ঞ তাঁর মেয়েকে লিখেছিলেন–একটা নতুন অর্কিড পেয়েছি। অপূর্ব নীল রঙের ফুল। তারপর যা বর্ণনা দিয়েছেন তা হুবহু এই ফুলের সঙ্গে মিলে যাচ্ছে। প্রশ্ন হল- সর্বজ্ঞর আবিষ্কার ডাক্তার কেন্টের হাতে এল কী করে? কেনই-বা উনি এ-ফুল। আমাদের কাছ থেকে লুকিয়ে রাখতে চান?

বললাম, “হয়তো সর্বজ্ঞ ডাক্তারকে গাছটা উপহার দিয়েছেন।

মামাবাবু বললেন, তাহলে এত লুকোচুরির দরকার কী?

সুনন্দ বলল,ডাক্তারকে তো প্রথমে দেখে খুব ভালো লোক বলেই মনে হয়েছিল।

মামাবাবু গম্ভীরভাবে বললেন, পৃথিবীতে এমন অনেক সৎ লোক আছেন যাঁরা তাঁদের শখের জিনিস সংগ্রহ করতে এমন সব কাণ্ড করে বসেন যা সুস্থ মস্তিষ্কে চিন্তাই করা যায় না! রূপা বলেছে, অর্কিড ফুলে নীল রঙ দুর্লভ! আর সর্বজ্ঞ লিখেছেন যে, এমন চমৎকার নীল অর্কিড আগে নাকি কখনও পাওয়া যায়নি।

আমি বললাম, ডাক্তারকে ওই ফুল সম্বন্ধে প্রশ্ন করলেন না কেন?

মামাবাবু বললেন, তাতে লাভ হত না। কারণ প্রমাণ কী? যদি বৈজ্ঞানিক সর্বজ্ঞর হদিস পাই তখন এ-রহস্যের কিনারা হতে পারে। আর তা না হলে বাধ্য হয়ে ডাক্তারের মুখ থেকে জোর করেই ওই অর্কিড এবং সর্বজ্ঞ সম্বন্ধে কথা আদায় করতে চেষ্টা করব।

বেশ চওড়া নদী মাদ্রে দ্য দিওস। দুপাশে ঘন উদ্ভিদরাজি। লোকালয় প্রায় নেই বললেই চলে। আমাদের লঞ্চ বেশ বড়, তাতে যাত্রীও অনেক। শ্বেতাঙ্গ, কৃষ্ণাঙ্গ, তাম্রবর্ণ রেড-ইন্ডিয়ান ইত্যাদি নানা জাতের মানুষ রয়েছে। আর রয়েছে কিছু গরু, ছাগল, মুরগি।

নানা বাণিজ্যসম্ভার উঠেছে লঞ্চে। কাঁদি কাঁদি কলা, রবারের গোলা, আখ, পেঁপে, ভুট্টা ইত্যাদি। তাছাড়া আধুনিক জগতে তৈরি টিনের খাবার, জামা-কাপড়, ওষুধপত্র। বনভূমিতে নিঃসঙ্গ খামারগুলির এসব জিনিস বড় দরকার।

এখানে লোকগুলো কেমন বেপরোয়া। কেমন যেন একটা গা-ছাড়া ভাব। সময় কেউ যেন ব্যস্ত নয়। লঞ্চ থামলে ধীরেসুস্থে ওঠে নামে, কথায় কথায় তর্ক বাধে। প্রায় কাছে পিস্তল বা ছুরি থাকে, যখন তখন টেনে বার করে। আবার দেখেছি পরস্পরের ভাবও হয়ে যায় চট করে! আমরাও আগ্নেয়াস্ত্র নিয়েছি। তবে মার্কোর ভাষায় শুধু আত্মরক্ষা এবং খাদ্য সংগ্রহের প্রয়োজনে। অরণ্য-অভিযানে উপস্থিত বুদ্ধি এবং দৃঢ় নার্ভই প্রধান হাতিয়ার।

এই লঞ্চেই বুড়ো পেড্রো লোপেজ আমার ও সুনন্দর নজরে পড়ে। ছোটখাটো মানুষটি নোংরা পোশাক পরে রেলিংয়ে ঠেস দিয়ে বসে আছে। মুখে অজস্র ভাঁজ। হুড দেওয়া জকি টুপি মাথায়। দাঁতে পাইপ কামড়ে চক্ষু মুদে ঝিমুচ্ছে।

একজন খালাসি চেঁচিয়ে বলে উঠল, "কী গো পেড্রো লোপেজ! যাচ্ছ কোথায়? নতুন কোনো খোঁজ-টোজ পেলে নাকি?

বৃদ্ধ তির্যক দৃষ্টিতে চাইল খালাসির দিকে, উত্তর দিল না।

খালাসি আবার বলল, এই বয়সে বেশি ঘোরাঘুরি কিন্তু ভালো নয় বুড়ো।

চকিতে খাড়া হয়ে উঠল বৃদ্ধের দেহ। ভাঙা গলায় হুঙ্কার ছাড়ল, খবরদার, বুড়ো বলবি নে! জানিস আমার হাতের টিপ এখনও কেমন? দেখবি নাকি পরীক্ষা করে?

ছোকরা খালাসি চট করে আড়ালে সরে গিয়ে মন্তব্য করল, উঃ, কী রাগী বুড়ো রে বাবা!

একজন বয়স্ক লোক পেড্রোকে কী জানি কী বলতেই সে তেড়ে উঠল। থাক, আর উপদেশ দিতে হবে না। আমার ভালো-মন্দ আমি বুঝব। জেনে রাখ–লোপেজ বংশের কেউ বিছানায় শুয়ে মরে না। মূখের দল! আমায় ঠাট্টা করা! হু-বরাত যদি ভালো হয় তো প্রমাণ করে দেব ফার্দিনান্দ লোপেজের কথা সত্যি কিনা।

পেড্রো সবার মুখের পানে চ্যালেঞ্জের ভঙ্গিতে তাকাল। মামাবাবু ও মার্কো অবশ্য ও-দৃশ্য দেখেননি।

হিথ নদীর সঙ্গমস্থলে আমরা লঞ্চ থেকে নামলাম।

গ্রামের ঘাটে পেড্রো লোপেজকে আবার দেখলাম। শুধু দেখা নয়, কথাও হল। পেড্রো। নিজেই এসে আমাদের বলল, তোমরা কোন দেশের লোক?

সুনন্দ বলল, ইন্ডিয়া।

উত্তরটা শুনে পেড্রো কিছুক্ষণ আমাদের দিকে চেয়ে থেকে আবার প্রশ্ন করল–তোমরা যাচ্ছ কোথায়?

সুনন্দ জবাব দিল, হিথ নদীতে ঘুরব। ছবি তুলব।

হুঁ...

পেড্রো ভুরু কুঁচকে বলল, "তোমাদের দেশ থেকে আরেকজন এসেছিল এখানে, তোমরা তার কেউ হও কি?

আমরা অবাক। কী উত্তর দেব ভেবে পাই না।

বুড়ো কিছুক্ষণ আমাদের দিকে চেয়ে থেকে উল্টোদিকে ঘুরে চলে গেল।

এবার আমরা টমকে খুঁজে বের করলাম। টম অল্পবয়সী আধা-ইন্ডিয়ান। ভালো মাঝি! দুটো ক্যান জোগাড় হল। ক্যানু হচ্ছে একরকম হালকা ছোট নৌকো। টম ছাড়া আরও তিনজন দেশি মাঝি নিলাম সঙ্গে। প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রে নৌকো বোঝাই করে আমরা দুদিন পরে জলে পড়লাম। ক্রমে হিথ নদীতে প্রবেশ করলাম। শুরু হল আমাদের আসল অভিযান।

.

০৪.

নিবিড় অরণ্যময় আদিম প্রাকৃতিক পরিবেশের মধ্যে দিয়ে চলেছি আমরা। গত তিন দিনে একটিমাত্র অন্য নৌকোর দেখা পেয়েছি। দুজন স্পেনীয় ব্যবসায়ী উপজাতিদের গ্রাম থেকে রবার সংগ্রহ করে ফিরছিল।

হিথ নদী চওড়া নয়, কিন্তু খরস্রোতা। দুধারে ঘন উদ্ভিদের রাজ্য। এ-বনের মজা হচ্ছে পাখি বা কীটপতঙ্গ ছাড়া বড় জীবজন্তুর দেখা সহজে পাওয়া যায় না। তবে কান পাতলে নানারকম ডাক শোনা যায়। আমাদের মাঝিদের তীক্ষ্ণ চোখ অবশ্য গাছের পাতার আড়ালে অনেক অদৃশ্য জীবের অস্তিত্ব আবিষ্কার করে। আর যেটা সকলেই দেখতে পায় সেটা হল বাঁদরের দাপাদাপি।

পাখি আর প্রজাপতি কত রকমের! সন্ধ্যার মুখে ঝাঁকে ঝাকে ওড়ে হলদে-সবুজ টিয়াপাখিরা। কর্কশ কলরবে নদীতট মুখর করে তোলে। দক্ষিণ আমেরিকার বড় জাতের টিয়া, যাদের বলে ম্যাকাও, সেগুলির পালকের রঙ দেখবার মতো। সবুজ, হলদে, লাল ও নীল মেশানো বিচিত্র বর্ণ। ঝড়ের মতো উড়ে যায় জোড়ায় জোড়ায়।

জলের মধ্যে ছোঁ মারে মাছরাঙা। বেনেবউয়ের মিষ্টি ডাক শোনা যায়। জলের ধারে লম্বা পা ফেলে পায়চারি করে সারস। কখনও দেখি ধ্যানমগ্ন বক। টুকটুকে লাল আইবিস সবুজের ভিতর চমৎকার দেখায়।

ধীরে ধীরে এগোই! কখনও নৌকো থামিয়ে তীরে উঠে বনে ঢুকি। মার্কো ছবি তোলে। পশু-পাখির। খোঁজে উপজাতি বসতি। মামাবাবু খোঁজেন নতুন প্রাণীর স্পেসিমেন। নদীতীরে যাও-বা কিছু পশুপাখি চোখে পড়ে, বনে ঢুকলে সব মিলিয়ে যায়, মিশে যায় গাছপাতার আবরণে।

এ-বনে পায়ে হেঁটে ঘোরা বড় কঠিন কাজ। বিশাল বিশাল মহীরুহের তলায় দিনের বেলাতেও সন্ধ্যার অন্ধকার। গাছের গুঁড়িকে পাক খেয়ে খেয়ে ওপরে উঠে গেছে মোটা মোটা লতা সূর্যালোকের সন্ধানে। মাথার অনেক ওপরে ডাল-পাতার ঘন আচ্ছাদন। কদাচিৎ একফালি রোদ এসে তিরের মতো মাটিতে পড়ে। বড় গাছের তলায় ঝোঁপঝাড়। কাটাগাছে গা ছড়ে যায়।

গাছপালা বেশিরভাগ অচেনা। মার্কো চিনিয়ে দেয়। কটন-উড, ব্রেজিল-নাট, নানা জাতীয় পাম। কোথাও দেখি জংলা পেঁপে আর কলা বন। একদিন মার্কো বলল, কাছেই নিশ্চয় রবার গাছ আছে। ওই শোন সেরিংগারো পাখির ডাক। ওই পাখি রবার গাছের গায়ে পোকা খায়।

প্যাচপ্যাচে কাদা জমিতে পুরু পাতার আস্তরণ। আমাদের বুট বসে যায়। মার্কো সাবধান করে দিল, দেখে শুনে পা ফেল। গর্তের মধ্যে পাতা জমে দিব্যি মরণফাঁদ হয়ে থাকে। ভুল করে ডুবে যাবে।

সবুজ, সবুজ আর সবুজ! রঙিন ফুল বনের ভিতর খুব কম। শুধু কখনও দেখিস গাছ উঁচু কোনো গাছের ডালে দুলছে। লম্বা উঁটির মাথায় গুচ্ছ গুচ্ছ নানা রঙের ফুল। চোখ-কান সজাগ রেখে এগোই।

একদিন বনের মধ্যে দিয়ে চলেছি, হঠাৎ আমার মাথায়, মুখে মাকড়সার জাল জড়িয়ে গেল। ছাড়াতে পারি না। মনে হচ্ছে যেন একটা মাছধরার জাল। স্থির হয়ে দাঁড়াও অসিট। মার্কোর কণ্ঠস্বর। তারপরই লাঠির আওয়াজ পাই–সপাং! চোখ পরিষ্কার করে দেখলাম মাটিতে মস্ত এক কোঁকড়ানো মাকড়সা। মার্কো বলল, আপাজাইকা স্পাইডার। ভাষণ বিষাক্ত এর কামড়।

প্রত্যেকের হাতে লাঠি থাকে। বিষাক্ত সাপের ভয়।–জারারাকা, বুস মাস্টার, ব্যাটল সাপ।

একটা জলাভূমিতে ফোটো তুলতে গিয়েছিলাম মার্কোর সঙ্গে। জলাতে প্রচুর এলিগেটর-কুমির ছিল। বেশ বড় কিন্তু অগভীর জলা। কুয়ারানা গাছ জন্মেছে জলার ভিতর। কুয়ারানা অনেকটা বাংলাদেশের সুঁদরী গাছের মতো। ছবি কিন্তু বেশিক্ষণ তোলা গেল না। কারণ প্রাণ বাঁচাতে দৌড় দিতে হল। না, কুমিরের তাড়া নয়, জোঁক। অসংখ্য জোঁক লাফাতে লাফাতে এল তেড়ে। আঙুলের মতো মোটা আর বিঘৎ খানেক লম্বা জোঁকগুলো। বাপরে, ওদের খপ্পড়ে পড়লে আর রক্ষা ছিল না।

নদীপথে ছোট ছোট জলপ্রপাত পড়ে প্রায়ই। দুরন্ত গতিতে জল ছুটেছে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড পাথরের চাইয়ের পাশ দিয়ে। লাফ দিয়ে পড়ছে কয়েক হাত নিচের পাথরের ওপর। মাঝিরা কী নিপুণ কৌশলে পাথর কাটিয়ে নৌকো নিয়ে যায়! কখনও জলে নেমে হাতে নৌকো টেনে পার করে জলপ্রপাতের বাধা। আমি ও সুনন্দ সুযোগ পেলেই নৌকো চালানো অভ্যেস করি। মার্কো অবশ্য এ-বিদ্যেতে ওস্তাদ।

রাতে বেশির ভাগসময় শুই তীরে গাছের ডালে হ্যামক বা দড়ির দোলনা-বিছানা টাঙিয়ে। কখনও শুই নৌকোয় বা তীরে তাঁবু খাঁটিয়ে। ভোরবেলা প্রায়ই বাঁদরের উৎপাতে মেজাজ বিগড়ে যায়। চকচকে লাল-রঙা মাইসিটি জাতের বাঁদরের গর্জনে কঁচা ঘুম যায়। ভেঙে। উঃ, কী বিকট চিৎকার! মনে হয় একদল উন্মাদ রণহুঙ্কার দিচ্ছে। আসলে কিন্তু মাত্র একটি বা দুটি পুরুষ-বাঁদরের গলা। কালো রঙের মেরিমোলে নামে বাঁদরগুলোও কম শয়তান নয়। হ্যামকের দড়ি ধরে এমন ঝাঁকায় যে ভয় হয় বুঝি ছিটকে পড়ব মাটিতে। ইচ্ছে হতো দিই বেটাদের গুলি মেরে খতম করে।

হ্যামকে শুয়ে মাথার ওপর দেখি গাছের ফাঁকে ফাঁকে ঝকঝকে নক্ষত্রখচিত টুকরো টুকরো আকাশপট। শুনি কানে তালা-ধরানো ঝিঁঝির ডাক। ব্যাঙের কর্কশ গম্ভীর গলার গান। ঝক ঝক জোনাকির আলোয় একটি একটি গাছ কেমন ভুতুড়ে লাগে। অবাক হয়ে ভাবি, এ কোথায় আমি? যে উদ্দেশ্য নিয়ে আমরা অভিযানে বেরিয়েছি তা সফল হবে। তো? ডক্টর সর্বজ্ঞকে খুঁজে পাব কি আমরা? তিনি কি বেঁচে আছেন, না সত্যিই তার সলিলসমাধি হয়েছে?

চারদিনের দিন মার্কো জানাল যে এক উপজাতি গ্রাম আছে সামনে তীরের কাছে বনের মধ্যে। আমরা গিয়ে দেখি একটু ফাঁকা জায়গায় তিন-চারটে বড় বড় কুটির। চারজন অচেনা বিদেশির আবির্ভাব প্রথমে কিছু আদিবাসী স্ত্রীলোক এবং ছোট ছেলেমেয়েদের নজরে পড়ল। অমনি দুড়দাড় করে সবাই দিল ছুট। সঙ্গে ছুটল তাদের পোষা কুকরগুলো। মানষে পশুতে পায়ে পায়ে জড়িয়ে কেউ পড়ল গড়িয়ে। চেঁচামেচি করতে করতে লাফ দিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে এল কয়েকজন পুরুষ। তাদের হাতে তির, ধনুক, বর্শা।

মার্কো চিৎকার করে দেশি ভাষায় বলতে লাগল–আমরা বন্ধু, আমরা বন্ধু। তখন গ্রামবাসীরা ধীরে ধীরে কাছে এগিয়ে এল। ওরা আমাদের সর্বাঙ্গ চাপড়ালো। আমরাও তাই করলাম। দেখতে দেখতে তাদের সন্দেহ কেটে গেল, আমাদের তারা বন্ধু বলে মেনে নিন

রেড-ইন্ডিয়ানদের চেহারা অনেকটা আমাদের দেশের নাগাদের মতো। খালি গায়ে নানা রঙের নকশা। মজার ব্যাপার লক্ষ করলাম, মেয়েদের চেয়ে পুরুষদের সাজসজ্জার বহর কিঞ্চিৎ বেশি। ছেলে বা মেয়েদের পরনে গাছের ছাল বা সুতির পোশাক। আধুনিক প্যান্ট বা পেটিকোটও পরেছে কেউ কেউ।

এই উপজাতিরা চাষ করে, মাছ ধরে। আমাদের উপহার দিল–কলা, ভুট্টা, ম্যানডিওকা। ম্যানডিওকা রাঙালুর মতো উদ্ভিদমূল। তার আটা বানিয়ে রুটি করে খায় এখানকার আদিবাসীরা। আমরা পরিবর্তে দিলাম পুঁতির মালা, লোহার বঁড়শি, রঙিন কাপড়।

মার্কো ওদের পিয়ানো একর্ডিয়ান বাজিয়ে শোনাল। ওরা তো মুগ্ধ। কেবল বলে, আরও বাজাও। শব্দ বের হলেই সবাই হেসে কুটিপাটি। এমন অদ্ভুত আওয়াজ তারা। কস্মিনকালেও শোনেনি।

আরও দু-তিনটে উপজাতি গ্রামে গিয়ে ছবি তোলা হল। সবার মেজাজই যে নরম তা নয়। কেউ কেউ বেশ উগ্র, বিদেশিদের পছন্দ করে না।–মার্কো কিন্তু ঠিক তাদের সঙ্গে ভাব জমিয়ে ফেলল।

একদিন নদী তীরে তাঁবু ফেলে বিশ্রাম করছি। দুপুরবেলা। মার্কো হঠাৎ প্রশ্ন করল, প্রোফেসর ঘোষ, এইভাবে খুঁজে বৈজ্ঞানিক সর্বজ্ঞর হদিশ পাবেন কি?

চমকে গেলাম মার্কোর কথা শুনে। মামাবাবুও অবাক। বললেন–আপনি জানলেন কী করে যে আমি বৈজ্ঞানিক সর্বজ্ঞর খোঁজ করছি?

মার্কো হাসল। আমার চোখ ও কান আছে। ডক্টর কেন্টকে অত প্রশ্ন করলেন আপনি। ইন্ডিয়ানদের গ্রামে গিয়ে সর্বজ্ঞর ফোটো দেখিয়ে খোঁজখবর করছেন। সব আমি লক্ষ

করেছি। জানি বৈজ্ঞানিক সর্বত্তর কেস রহস্যজনক। কিন্তু সঠিক কোনো ক্লু পেয়েছেন কি?

মামাবাবু খানিক চুপ করে থেকে বললেন, পেয়েছি।

কী?

মামাবাবু সমস্ত বললেন। ভিক্টরের তোলা সেই ফোটো, দুর্ঘটনাস্থল থেকে অনেক দূরে সত্যনাথ সর্বজ্ঞর হ্যাট ও টাই পরা উপজাতি সর্দারের ছবি। এ-বিষয়ে মামাবাবুর অনুমান।

শুনে মার্কো উত্তেজিত হয়ে উঠল–ইস, আগে বলতে হয়! মিছিমিছি কটা দিন নষ্ট হল। চলুন সোজা সর্দারকে ধরিগে।

সেইদিনই এক অদ্ভুত ঘটনা ঘটল।

আমি আর সুনন্দ বনে ঢুকেছি। ইচ্ছে সজারু বা এগুটি পেলে শিকার করব। প্রকাণ্ড একটা গাছের কাছে গিয়ে শুনি কেমন বিচিত্র আওয়াজ হচ্ছে। কড়মড় মড়মড় জাতীয়। কীসের শব্দ? আবিষ্কারের চেষ্টায় ওপরে চেয়ে আছি, দেখলাম এক দঙ্গল টিয়াপাখি গাছ থেকে বেরিয়ে উড়ে পালাল। হঠাৎ সামনে আমাদের দুজনকেই চমকে দিয়ে আবির্ভূত

হল আমাদের এক চেনা লোক।-পেড্রো লোপেজ। সে হুঙ্কার ছাড়ল–সরে এসো ওখান থেকে–এক্ষুনি।

অবাক হয়ে দেখছি তাকে। পেড্রো খ্যাঁক করে আমাদের জামা ধরে হিড়হিড় করে টানতে টানতে নিয়ে চলল। ওঃ, বুড়োর গায়ে তো আচ্ছা জোর!

বেশ খানিকটা যাবার পর নিজেদের ছাড়িয়ে নিয়ে রেগে বললাম, কী ব্যাপার।

উত্তরের আগেই এক কর্ণভেদী শব্দে শিউরে উঠলাম। সেই বিশাল গাছটা সমস্ত অরণ্যটাকে কাঁপিয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল। আর আধ মিনিট ওখানে থাকলে আমরা ওই গাছের তলায় চাপা পড়ে পিষে যেতাম।

পেড্রো পাইপে টান দিয়ে বলল, বৃষ্টির জলে শিকড় আলগা হয়ে গিয়েছিল। অনেকক্ষণ ধরে পড়ছিল গাছটা। জঙ্গলের জ্ঞান নেই মূর্খ। মরতে এক্ষুনি!

কী বলে ওঁকে ধন্যবাদ দেব ভাবছি, এমন সময় পেড্রো বলল–ম্যাপটা পেলে কোথায়?

বললাম, ম্যাপ! কীসের ম্যাপ?

পেড্রো তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠল। বটে, বলবে না? চেপে যাচ্ছ? দেখ, একজন ভারতীয় মরেছে। তোরাও মরবি। লোপেজ বংশের হক্কের ধন গাপ মারা অত সোজা নয়। বুঝলি?

পেড্রো হন করে বনের ভিতর অদৃশ্য হল।

স্তম্ভিত হয়ে থেকে বললাম, লোকটা পাগল নাকি?

সুনন্দ বলল, হতে পারে। কিন্তু বৈজ্ঞানিক সর্বজ্ঞর বিষয়ে কি ও কিছু জানে? ওর কোনো হাত আছে নাকি? শুনলি ওর কথা? এমন খ্যাপাটে লোক অনেক সময় ডেনজারেস হয়।

তাঁবুতে ফিরে মামাবাবু ও মার্কোকে পেড্রোর কথা জানালাম। দুজনেই একটু চিন্তিত হলেন। মার্কো বলল, খেয়াল রেখো, লোকটাকে আবার দেখলে ধরব। জানতে হবে সর্বত সম্বন্ধে ও কী জানে!

দুঃখের বিষয় আমরা আর পেড্রোর দেখা পেলাম না। কিন্তু আমার মনে হচ্ছিল, পেডো ঠিক আমাদের অনুসরণ করছে লুকিয়ে লুকিয়ে।

.

০৫.

নৌকো চলেছে। দুপাশে সেই একঘেয়ে বনভূমি, সেই একই প্রাণিজগৎ। নতুনত্বের মধ্যে একটা বিশাল আনাকোন্ডা দেখলাম। জলের কিনারে গাছের ডাল পাকে পাকে জড়িয়ে মাথা ঝুলিয়ে ওৎ পেতে ছিল, দক্ষিণ আমেরিকার এই অজগর। ভাগ্যিস দেখতে পেয়েছিল। মাঝিরা, কোনোরকমে একটা গাছের ঝুরি আঁকড়ে নৌকো থামিয়ে ফেলল। তারপর অনেকখানি সরে এড়িয়ে গেল সেই মহাসর্পের উদ্যত আলিঙ্গন।

আর সুনন্দ একদিন ইলেকট্রিক ইল মাছের শক খেল। ইল আমাদের দেশের বান মাছের মতো দেখতে। লম্বাটে গড়ন। মাঝিরা জাল পেতে মাছ ধরছিল নদীতে। একটা ছোট ইলেকট্রিক ই আটকা পড়েছিল তার মধ্যে। সুনন্দ মাছ বের করতে জালের ভিতর হাত ঢোকাতেই শক খেয়ে কুপোকাৎ। বেচারার শরীর অনেকক্ষণ অসাড় হয়ে ছিল। মার্কো প্রাণপণে ম্যাসাজ করে সুনন্দকে সুস্থ করে তুলল। তারপর শুরু হল তার ঠাট্টা।–কী হে বীরপুরুষ, বুঝছো তো কী ডেনজারেস এই দেশ! এখনও ভেবে দেখ ফিরে যাবে কিনা?

শুনলাম বড় ইলেকট্রিক ইল-এর শকে নাকি মানুষের জীবনহানিও ঘটতে পারে।

আমরা এক ব্যারাকায় উপস্থিত হলাম।

এদেশে চাষ বা পশুপালন খামারকে বলে ব্যারাকা। নদী থেকে মাইলখানেক দূরে বনের ভিতর অনেকখানি জমি পরিষ্কার করে খামার তৈরি হয়েছে। মালিক এক জার্মান, নাম মুলার। কাঠের বাংলোবাড়িতে বৃদ্ধ একা থাকে, সঙ্গে থাকে কয়েকজন দেশি পরিচারক। চাষবাস করে, গরু, ছাগল পোষে, উপজাতীয় লোকে শ্রমিকের কাজ করে। এমন গহন বনে সভ্য মানুষের বাস কল্পনা করিনি। মার্কো বলল, আমাজন অববাহিকার। অরণ্যে এমন অনেক ব্যারাকা আছে।

মুলার আমাদের পেয়ে ভীষণ খুশি। অনেক কষ্টে জোগাড় করা মহা মূল্যবান বিস্কুট এবং কফি খাওয়াল। রাঁধুনিকে অর্ডার দিল, অতিথিদের আপ্যায়নের জন্য আজ কচ্ছপের স্যুপ আর টেপিরের মাংস বানাও।

মুলার গল্প করল যে, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে সে ছিল একজন মেজর। হিটলারের মতবাদ পছন্দ না হওয়াতে একবার পেরুতে জাহাজ আসতে সোজা নেমে পালিয়ে যায় আমাজনের বনে। যুদ্ধের শেষে দেশে গিয়ে দেখে আপনজন প্রায় সবাই মারা গেছে, তাই আবার ফিরে আসে দক্ষিণ আমেরিকায়।

মুলার খুব দাবার ভক্ত। বলল, দাবা খেলার লোভে মাঝে মধ্যে শহরে যাই। বেশিদিন টিকতে পারি না কিন্তু।

মুলার অনুরোধ করেছিল, আরও কিছুদিন থেকে যাবার জন্য, কিন্তু আমাদের তাড়া ছিল তাই বিদায় নিলাম।

মলারের ব্যারাকা ছাড়ার সময় দুজন লোক আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। হিথ নাতে একখানা ডিঙিনৌকোয় বসে তারা চুরুট টানছিল এবং আমাদের লক্ষ্য করছিল।

মার্কো বলল, ডাক্তার বলেছে, এ-অঞ্চলে কয়েকজন পলাতক বিদ্রোহী সেন্য আর নিয়েছে। তারা লুটপাট ছিনতাই করছে। এ লোক দুটোর হাবভাব সন্দেহজনক। দেখ, কোমরে আর্মি বেল্ট।

আরও দুদিন নদীপথে যাত্রার পর আমরা গন্তব্যস্থলে পৌঁছলাম। তীরে কয়েকজন রেড-ইন্ডিয়ান ঘোরাঘুরি করছিল। মার্কো তাদের ডাকল। এরা বেশ সপ্রতিভ, ডাকতেই কাছে এল। আমরা চারজনে ওদের সঙ্গে ওদের গ্রামে চললাম।

সর্দারকে চিনতে অসুবিধা হল না। অবিকল সেই ফোটোর মুখ। তবে হ্যাট বা টাই নেই। কিছু নুন উপহার দিতে সে বেজায় খুশি, কারণ জঙ্গলে নুনের বড় অভাব। বৈজ্ঞানিক সর্বজ্ঞর ফোটো এবং ভিক্টরের তোলা সর্দারের ফোটো দেখিয়ে মার্কো সর্দারের সঙ্গে কিছু আকার-ইঙ্গিতে, কিছুটা ভাষার সাহায্যে আলাপ শুরু করল।

সর্দার মন দিয়ে নিজের ফোটোখানা দেখল। তারপর হঠাৎ উঠে এক কুটিরের মধ্যে ঢুকে গেল। কী ব্যাপার!

অল্পক্ষণের মধ্যেই আবার আবির্ভূত হল সর্দার। এবার তার মাথায় সেই গোল শোলার টুপি, গলায় সেই টাই বাঁধা। দু-বগলে দুই সঙ্গীকে চেপে ধরে সে ইশারা করল, ছবি তোলো।

মার্কো তৎক্ষণাৎ ছবি তুলে সর্দারের সঙ্গে আরও কিছু কথা বলে মামাবাবুকে জানাল, সর্দার সর্বজ্ঞকে চিনেছে। এখানে এসেছিলেন। পাথরে লেগে তার নৌকো ফুটে হয়ে যায়। ইন্ডিয়ানরা তার নৌকো মেরামত করে দেয় তাই পুরস্কারস্বরূপ সর্দার ওই টুপি এবং টাই চেয়ে নেয়। পরদিন সকালে দেখে বৈজ্ঞানিক চলে গেছেন। কোন দিকে গেছেন তা সে জানে না।হ্যাঁ, বৈজ্ঞানিকের সঙ্গে একজন ইন্ডিয়ান অনুচর ছিল। সে অন্য জাতের লোক।

মামাবাবু খুব নিরাশ হলেন। তিনি আশা করেছিলেন এখানে সর্বজ্ঞ সম্বন্ধে সঠিক কোনো খবর পাবেন।

নির্জন নদীতীরে বিকেলবেলা।

নদীর ওপরে গাছের মাথায় ঘন সবুজ পল্লবগুচ্ছের গায়ে রাঙা রোদ পড়ে চকমক করছে। ছুটন্ত জলের বুকে থিরথির করে কাঁপছে বাঁশ আর তালগাছের ছায়া। মামাবাবু আর মার্কো গেছেন উপজাতিদের গ্রামে। মাঝিরা বনে ঢুকেছে শুকনো কাঠ সংগ্রহ করতে। সুনন্দ তাঁবু খাটাবার চেষ্টা করছে। হঠাৎ কী হে ছোকরারা?

বিষম কর্কশ গলায় স্প্যানিশ ভাষা শুনে চমকে ফিরলাম।

সেই দুই মূর্তিমান মুলারের খামারের কাছে যাদের দেখেছি, তাদের একজনের হাতে উদ্যত পিস্তল। পিস্তলধারী গর্জন করে উঠল, "খবরদার, নড়লেই গুলি করব। মাথার ওপর হাত তোলো।

মাটিতে বসে ছিলাম। অগত্যা বসে বসেই হাত তুললাম।

পিস্তলধারী তার সঙ্গীকে বলল, র‍্যাপসো, দেখ তো হে মালকড়ি কী আছে?

র‍্যাপসে হামলে পড়ল আমাদের ব্যাগগুলোর ওপর। টপাটপ খাবারের টিন ও প্যাকেটগুলো বের করতে করতে র‍্যাপসো খ্যাক খ্যাক করে হেসে মন্তব্য করল, "বুঝলে রস, আজ দারুণ কপাল। ঘুম ভেঙেই আর্মাডিলো দেখে তখনই বুঝেছি আজ দিন ভালো যাবে।

খুশির চোটে পিস্তলধারী রস একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিল। তার চোখ মাঝে মাঝে আটকে যাচ্ছিল লুটের মালের ওপর। দুই অর্বাচীন ভারতীয় ছোকরা সম্বন্ধে বিশেষ সতর্ক থাকার প্রয়োজনবোধ করছিল না। নয়তো ভেবেছিল এক ধমকই যথেষ্ট। আমি লক্ষ করলাম লোকটা মাটিতে বিছানো তাঁবুর এক প্রান্তে দাঁড়িয়ে আছে। সুনন্দকে ইশারা করলাম। তারপর যেই লোকটা একবার আমাদের থেকে চোখ সরিয়েছে ঝট করে হাত নামিয়ে তাঁবুর কাপড় আঁকড়ে মারলাম এক হেঁচকা টান। একসঙ্গে দুজনেই কুপোকাৎ।

সঙ্গে সঙ্গে রসের পিস্তল সরব হয়ে উঠল। কিন্তু বেটাল হয়ে ফসকে গেল টিপ। পা হড়কে মাটিতে বসে পড়ল। পিস্তল ছিটকে গেল হাত থেকে। নিমেষে পকেট থেকে রিভলবার বের করে রসের মাথা তাক করে বললাম, এবার তোমাদের পালা। হাত তোলো। উঠে দাঁড়াও, নইলে–

ইতিমধ্যে সুনন্দ র‍্যাপসোকে লক্ষ্য করে রিভলবার বাগিয়েছে। মাথার ওপর হাত তুলে দাঁড়ানো দুই বন্দীর অবস্থা হল দেখবার মতো। রাগে লজ্জায় মুখ তাদের ভয়ঙ্কর হয়ে। উঠেছে।

মামাবাবুরা ফিরলেন একটু পরে। এই দৃশ্য দেখে তারা তো চমৎকৃত। মার্কো হেসে বলল, সাবাস ব্রাদার! নাঃ, তোমাদের যত নাবালক ঠাউরে ছিলাম তত নও। ঘুঘু দুটোকে আচ্ছা জব্দ করেছ।

মার্কো ওদের প্রশ্ন করল, “তোমরা নিশ্চয় জেনারেল ফ্র্যাঙ্কোর দলের পলাতক সৈন্য। বেড়ে ব্যবসা ধরেছ তো হে! টম, লোক দুটোকে বাঁধো।

মামাবাবুর আচরণে আমরা আশ্চর্য হলাম। তিনি র‍্যাপসের কাছে গিয়ে তার শার্ট পরীক্ষা করতে লাগলেন।

র‍্যাপসোর ছেঁড়া সস্তা খাকি প্যান্টের সঙ্গে অমন দামি নেভি-ব্লু শার্টখানা বেমানান বটে, কিন্তু তা নিয়ে অত মাথা ঘামাবার কী দরকার?

এ শার্ট কোথায় পেয়েছ? মামাবাবু কঠোর স্বরে প্রশ্ন করলেন।

কেন? র‍্যাপসো খেঁকিয়ে পাল্টা প্রশ্ন করল।

দরকার আছে। ঠিক ঠিক জবাব দাও।

আমি কিনেছি।

বটে! বনের ভিতর দোকান আছে নাকি?

মামাবাবুর কণ্ঠে বিদ্রূপ–আবার পয়সা দিয়ে এত ছোট মাপের শার্ট কিনেছ! র‍্যাপসো নিরুত্তর।

মামাবাবু মার্কোকে বললেন, শার্টটা দেখেই আমার সন্দেহ হয়েছিল। ভীষণ চেনা-চেনা লাগছিল। বৈজ্ঞানিক সর্বজ্ঞ ফোটোতে ঠিক এমনি শার্ট পরে রয়েছেন। বুকের কাছে সাদা ফুল তোলা। তুমিও মিলিয়ে দেখ ফোটোর সঙ্গে।

মামাবাবু ব্যাগ থেকে ফোটো বের করলেন। আমরা দেখলাম–অবিকল সেই শার্ট।

মামাবাবু বললেন, আপাতত জানতে হবে এ শার্ট ও পেল কী করে এবং সর্বজ্ঞকে ওরা কী করেছে? মনে হচ্ছে এরা সর্বজ্ঞর ওপর ডাকাতি করেছিল। দেখ চেষ্টা করে কথা বের করতে পারো কিনা।

মার্কো গম্ভীর বদনে ধীরেসুস্থে একটা সিগারেট ধরাল। তারপর মোলায়েম গলায়। বলল– মিস্টার র‍্যাপসো, বড়ই দুঃখের বিষয় তুমি এমন অসময়ে বোবা হয়ে গেলে। যাক এই রোগের দুটো দাওয়াই আমার মনে পড়েছে। দেখ কোনটি তোমাদের পছন্দ হয়।

প্রথম নম্বর, তোমাদের গ্রেফতার করে নিয়ে যাব এবং তারপর গভর্নমেন্টের হাতে সমর্পণ করব। বিদ্রোহী সৈন্য হিসেবে আশা করি তোমাদের ফাঁসিকাঠে ঝোলানো হবে। দ্বিতীয় নম্বর, তোমাদের দুটিকে নদীর ধারের ওই দুটো গাছে বেঁধে রাখব। গাছগুলো

নিশ্চয় চেনা। বন্দী করে নিয়ে যাওয়া ঝামেলা। তাই দ্বিতীয় ওষুধটাই প্রথমে এক্সপেরিমেন্ট করা যাক।

দুই বন্দী ঘাড় ফিরিয়ে গাছ দুটো দেখল। স্পষ্ট দেখলাম তাদের মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেল। কৌতূহল হল ওটা কী গাছ?

নদীতীরে কয়েকটি গাছ দাঁড়িয়ে। ছোট ছোট গাছ, সোজা সুরু গুঁড়ি। গুঁড়ির নিচের অংশে ডালপালা নেই। একটি বৈশিষ্ট্য লক্ষ করলাম যে, প্রত্যেক গাছের গোড়ার চারপাশে মাটিতে এক কণাও ঘাসের চিহ্ন নেই।

মার্কো এবার আমাদের উদ্দেশ্য করে বলল, ওই গাছের নাম পালো-সান্টো। দেখতে নিরীহ, কিন্তু আসলে অতি মারাত্মক। এই গাছের প্রত্যেকটি কাঠ হল কাঠপিঁপড়ের ডিপো। যে কোনো প্রাণী ওই গাছ স্পর্শ করলেই অগুনতি পিঁপড়ে তাকে তৎক্ষণাৎ আক্রমণ করবে। কয়েক ঘণ্টা ওই গাছের গায়ে বেঁধে রাখলে বাছাধনদের মুখে আশাকরি বাক্য ফুটবে। ইন্ডিয়ানরা এইভাবে তাদের অপরাধীদের শাস্তি দেয়। শুনেছি প্রায় আসামী অসহ্য যন্ত্রণায় উন্মাদ হয়ে যায়। কেউ কেউ মারাও যায়।

র‍্যাপসো ও রস হাউমাউ করে উঠল। সেনর, দয়া করুন। সব বলছি।

বেশ, বলো। আমরা ওই শার্ট লুট করে পেয়েছি।

কতদিন আগে?

সাত-আট মাস হবে।

একে চেনো? মামাবাবু সর্বজ্ঞর ফোটো বের করলেন।

হ্যাঁ হ্যাঁ, এই লোকেরই জিনিস।

কী করেছ তাকে? খুন?

না না। দুজনে সরবে আপত্তি জানায়। আমরা তার গায়ে হাত দিইনি। ও তখন ছিল । ওর জিনিস নিয়ে একজন ইন্ডিয়ান মাঝি নৌকোয় বসেছিল। তাকে ভয় দেখিয়ে আমরা কিছু খাবার আর পোশাক কেড়ে নিই।

সত্যি কথা? কড়া ধমক দেয় মার্কো।

সত্যি, মা মেরির দিব্বি।

তারপর? মামাবাবু প্রশ্ন করেন। তারা নৌকো নিয়ে কোন্ দিকে গেল?

তা জানি না। তবে মাঝিটা বলছিল, তারা নাকি পাহাড়ি ইন্ডিয়ানদের গ্রামের দিকে যাবে।

সে কোন দিকে?

এই নদীপথে কিছু এগিয়ে ডান পাশের এক শাখানদী ধরে গেলে পাহাড়ে পৌঁছনো যায়। তিন-চার দিনের পথ।

ওই দুজন আবার ফিরে এসেছিল এ-পথে? মামাবাবু জানতে চান।

না। পাহাড়ি ইন্ডিয়ানদের হাতে হয়তো মারা পড়েছে। ওই ইন্ডিয়ানরা দারুণ হিংস্র।

তোমরা ঠিক জানো?

হ্যাঁ। এই নদীতে আমাদের চোখ এড়িয়ে কেউ যাওয়া-আসা করতে পারে না। ডাক্তার কেন্ট ফিরেছিল, কিন্তু ওরা ফেরেনি।

মামাবাবু তীক্ষ্ণ স্বরে বললেন-তোমরা চেনো ডাক্তারকে?

চিনি, তবে আলাপ নেই। ডাক্তারকে এ-অঞ্চলে সবাই চেনে। ওদের কণ্ঠে বেশ সমীহ ফুটে ওঠে।

ভক্তার এ-পথে গিয়েছিল? মামাবাবু জানতে চান।

হ্যাঁ।

কবে?

ওরা চলে যাবার দুদিন পরে।

ডাক্তার ফিরল কবে?

তিন-চার দিন পরে।

বন্দী দুজনকে ছেড়ে দেওয়া হল।

মামাবাবু গম্ভীরভাবে একটা পাথরের ওপর বসলেন।

আবার সেই রহস্যজনক ডাক্তারের অস্তিত্ব। বৈজ্ঞানিক সর্বজ্ঞর সঙ্গে এই ডাক্তারটির যোগাযোগ বারবার আবিষ্কার করছি। কেন ডাক্তার এসেছিল সর্বজ্ঞর পিছনে পিছনে? কিন্তু এ-বিষয়ে সে কাউকে কিছু বলেনি তো! কেন এই লুকোচুরি? আমার মনে ডাক্তারের আচরণের একটাই ব্যাখ্যা খুঁজে পাই। ডাক্তার লুকিয়ে লুকিয়ে বৈজ্ঞানিককে অনুসরণ করে যায় পাহাড়ের দিকে। তারপর তাকে সরিয়ে দিয়ে হাত করেছে সর্বজ্ঞর আবিষ্কার সেই নীল অর্কিড। অর্কিড হয়তো সর্বজ্ঞর সঙ্গে ছিল। কিংবা ওটা ডাক্তারের কাছে গচ্ছিত রেখে তিনি অভিযানে বেরিয়েছিলেন। বৈজ্ঞানিক সর্বজ্ঞ না থাকলে সেক্ষেত্রে ডাক্তার হবে ওই অর্কিডের মালিক। কারণ আর কেউ জানে না এই আবিষ্কারের কথা।

মামাবাবু মুখ তুললেন।–মিঃ মার্কো, মনে হচ্ছে ওই পাহাড়িদের গ্রামেই এই রহস্যের শেষ সূত্রটি লুকিয়ে আছে। আমি নিশ্চিত জানতে চাই ডাক্তারের সঙ্গে সর্বজ্ঞর ওখানে দেখা হয়েছিল কিনা? না অন্য কোনো দুর্ঘটনায় পড়েন সর্বজ্ঞ। যদি বুঝি ডাক্তার কেন্টই বৈজ্ঞানিকের মৃত্যুর জন্য দায়ী, তাহলে–মামাবাবু দাঁতে দাঁত চাপলেন।

–এখন আমি ওই পাহাড়ি ইন্ডিয়ানদের কাছে যাব। আপনি কি যাবেন সঙ্গে? আপনার যা খুশি।

মার্কো উত্তর দিল, আলবৎ যাব। এমন মিস্ত্রির শেষ অধ্যায়ে আমি কি বাদ পড়ব? সে হতেই পারে না।

.

০৬.

পাহাড়ি ইন্ডিয়ানদের সম্বন্ধে মার্কো যে রিপোর্ট আনল তা বেশ ভয়ের। ওরা দুর্দান্ত জাত। অন্য উপজাতির সঙ্গে মোটে মেলামেশা নেই। বিদেশি কেউ ওদের এলাকায় যাওয়া পছন্দ করে না। অনেকে ওই অঞ্চলে গিয়ে আর ফেরেনি। কদাচিৎ ওদের নদীপথে দেখা যায়। হিথ নদীর পশ্চিম পাশে কয়েকটা জঙ্গলাকীর্ণ পাহাড় আছে, তারই একটায় ওদের বাস।

টম ও অন্য মাঝিরা অনিচ্ছা প্রকাশ করল ওই এলাকায় যেতে। ঠিক হল ওরা এইখানে আমাদের জন্য অপেক্ষা করবে। শুধু আমরা চারজন যাব একটা নৌকো নিয়ে।

পরদিন সকালে আমরা যাত্রা করলাম। বিকেল নাগাদ ডান দিকের এক শাখানদীতে প্রবেশ করলাম। এই স্রোতধারাই আমাদের পাহাড়ের পাদদেশে নিয়ে যাবে।

ক্ষীণ জলধারা এঁকেবেঁকে চলেছে। জল কম, কিন্তু স্রোত প্রখর। দুধারে ঝুঁকে পড়েছে গাছপালা। যেন উদ্ভিদে তৈরি সুড়ঙ্গের ভিতর দিয়ে চলেছি। ধারে কাছে জনমানবের চিহ্ন

নেই। মানুষের কোলাহল, গাড়ির আওয়াজ, ইলেকট্রিক আলোর ঝলমলানি–এসব যেন স্বপ্নের বস্তু।

নিজেরা দাঁড় বাইছি। বারবার জলপ্রপাতের বাধায় ভীষণ অসুবিধায় পড়তে লাগলাম। তখন আমরা জলে নেমে ধার দিয়ে ক্যানু ঠেলে নিয়ে চলতে লাগলাম।

প্রথম রাতে এক উপদ্রব ঘটল। ভোরবেলা হ্যামক থেকে নেমে ঘাড়ে হাত দিয়ে দেখি ফোঁটা ফোঁটা রক্ত ঝরছে। মার্কো পরীক্ষা করে বলল, এ ভ্যাম্পায়ার ব্যাট-এর কীর্তি। তাড়াতাড়ি এলাকাটা পেরিয়ে গেলাম।

পরদিন দুপুরে সুনন্দ এক কাণ্ড করে বসল। নদীতীরে ঘাসের ওপর শুয়ে চোখ বুজে একটু বিশ্রাম নিচ্ছি সবাই, হঠাৎ সুনন্দর চিৎকারে ধড়মড় করে উঠে বসলাম। মার্কো মুহূর্তে রাইফেল তুলেছে। পরক্ষণেই সে অট্টহাসিতে ফেটে পড়ল। দেখি একটা ভাল্লুকের মতো জন্তু, কিন্তু মুখে ছোট্ট শুড়, বনের মধ্যে পালাল। সুনন্দ স্তম্ভিতভাবে প্রশ্ন করল–কী ওটা?

অ্যান্টইটার। জানাল মার্কো।

“ওঃ, আমার আঙুল সুড়সুড় করে উঠল। আমি ভাবলাম বুঝি–

বুঝেছি, ভ্যাম্পায়ার ব্যাট। কিন্তু জেনে রাখো, রক্তপায়ী বাদুড় দিনে বেরোয় না। নিশ্চয় পিঁপড়ে উঠেছিল তোমার পায়ে, এ-বেচারা লম্বা জিভ দিয়ে সেগুলো খাচ্ছিল। উপকার করতে গিয়ে তোমার লাথি খেয়েছে।

তিন দিন, তিন রাত কাটল। উঃ, কী কষ্টকর যাত্রা! বারবার জলে নেমে নৌকো টানতে গিয়ে পাথরে পা কেটে ক্ষতবিক্ষত হল। মশা-মাছির আক্রমণে হাত-মুখ উঠল ফুলে। চতুর্থ দিনে দেখলাম নদী দুই ধারায় ভাগ হয়ে গেছে। সোজা পথটা নিলাম বেছে। মাইলখানেক এগোবার পর বিরাট এক জলাভূমির ভিতর গিয়ে পড়লাম। অগভীর জলা। ওপারে পাহাড়, ঘন বনে ঢাকা। এই জলা পেরিয়ে পাহাড়ে পৌঁছনো যায় কিনা আলোচনা করছি, মার্কো চেঁচিয়ে উঠল–সাবধান, সাপ!

আশেপাশে লক্ষ করে শিউরে উঠলাম। জলে অগুনতি সাপ। ভয়ানক বিষধর জারারাকা সাপের বিচরণক্ষেত্রে এসে পড়েছি। নৌকোর চারধারে হিস হিস গর্জন। প্রকাণ্ড লম্বা কয়েকটা সাপ নলখাগড়ার গা বেয়ে নৌকোয় লাফিয়ে ওঠার চেষ্টা করতে লাগল। সপাং সপাং লাঠি চালালাম। সাপগুলো লাঠির ঘায়ে একটু দূরে সরে যেতে কোনোরকমে নদীতে পালিয়ে গেলাম। মাত্র আধঘণ্টা কেটেছিল ওই জলায়, কিন্তু সেই ভয়াবহ অভিজ্ঞতার স্মৃতি কখনও ভুলব না।

পরদিন নদীর দ্বিতীয় ধারাটা অনুসরণ করে আমরা এগোলাম।

আমাদের জন্য এক ভয়ঙ্কর দুর্ঘটনা অপেক্ষা করছিল।

পরদিন সকালে সুনন্দকে নদীতীরে রেখে আমি, মার্কো ও মামাবাবু বনের ভিতরে গিয়েছিলাম। সুনন্দর ডান হাঁটু পাথরে ঘা লেগে ফুলে উঠেছিল। হাঁটতে কষ্ট হচ্ছে, তাই যায়নি আমাদের সঙ্গে। মার্কো খাবার জন্য কয়েকটা পাখি শিকার করল। মামাবাবু একরকম ছোট্ট বাঁদর মারমোসেট-এর ধরন-ধারণ লক্ষ করলেন অনেকক্ষণ ধরে। এইভাবে ঘণ্টা দুই কাটিয়ে নৌকোয় ফিরে আমরা চমকে উঠলাম। নদীতীরে আমাদের জিনিসপত্র সব লণ্ডভণ্ড অবস্থায় ছড়ানো। নৌকোটা উল্টিয়ে পড়ে আছে পাড়ে।

আর সুনন্দ নেই!

সুনন্দ! সুনন্দ! অনেক ডাকাডাকি করলাম। কোনো সাড়া মিলল না। অনেক খোঁজাখুঁজি করলাম, কিন্তু সুনন্দকে পাওয়া গেল না।

মার্কো জমি পরীক্ষা করে বলল, "ইন্ডিয়ানরা এসেছিল নৌকো করে। ওরা নিশ্চয় সুনন্দকে জোর করে তুলে নিয়ে গেছে। ধস্তাধস্তির চিহ্ন দেখছি। কিছু জিনিসও চুরি করেছে লোকগুলো। তবে রক্তের দাগ দেখছি না। সম্ভবত সুনন্দ তেমন আহত হয়নি। বন্দী করে নিয়ে গেছে ওকে।

মামাবাবুর মুখ পাথরের মতো কঠিন হয়ে উঠল। গম্ভীর কণ্ঠে বললেন, চলো, এখুনি বেরোই। ইন্ডিয়ানদের ধরতে হবে, খুঁজে বের করতে হবে ওদের আস্তানা। হয়তো তাড়াতাড়ি করলে সুনন্দর প্রাণ বাঁচাতে পারব।

তখুনি নৌকো নামালাম জলে। প্রাণপণে দাঁড় বাইতে লাগলাম। মার্কো একবার বাঁকা হেসে বলল, জানো অসিট, অনেকদিন শিকার প্রায় ছেড়ে দিয়েছি। অকারণ প্রাণিহত্যা আর করি না। কিন্তু সুনন্দকে যদি ফিরে না পাই, ওই পাহাড়ি ইন্ডিয়ানগুলোকে আমি এমন শিক্ষা দেব! মার্কোর চোখ দুটো যেন দপ করে জ্বলে উঠল।

বুঝলাম, এই আমুদে রসিক লোকটির মধ্যে ঘুমিয়ে থাকা দুর্দান্ত মানুষটা আবার জেগে উঠেছে।

তাড়াহুড়ো করতে গিয়ে ক্ষতি হল। হঠাৎ পাথরে ঠোক্কর লেগে নৌকোর তলা গেল ফেঁসে। এবার হাঁটা ছাড়া উপায় নেই। মার্কো বলল, ফেরার সময় একটা ভেলা তৈরি করে নেব, অবশ্য যদি ফিরি।

নৌকো তীরে তুলে রাখলাম। ভারী জিনিস সব বাক্সবন্দী করে সেখানে রেখে দেওয়া হল। বাকি জিনিস পিঠে নিয়ে হাঁটা দিলাম। আমার মনে কেবল একটা চিন্তাই ঘুরছে– সুনন্দ নেই। কী হল সুনন্দর? আবার তার সঙ্গে দেখা হবে তো? সমস্ত ব্যাপারটা যেন ভারি অবাস্তব মনে হচ্ছে। ও কি সত্যি হারিয়ে গেল চিরকালের মতো? তাহলে। আমিই

বা ফিরব কোন মুখে? সুনন্দর সঙ্গে বহু দিনের বন্ধুত্বের কত টুকরো টুকরো স্মৃতি ভেসে ওঠে মনে।

মামাবাবু একটা টিনের কৌটো কুড়িয়ে পেলেন। বায়ুশূন্য মাংস রাখার টিন। অর্থাৎ কোনো শহুরে মানুষের পদার্পণ ঘটেছিল কিছুকাল আগে। কে সে? হয়তো বৈজ্ঞানিক সর্বজ্ঞ। এই পথে গিয়ে তিনি হারিয়ে গেছেন, বুনো পাহাড়ি ইন্ডিয়ানদের খোঁজে। সুনন্দও পড়েছে তাদের খপ্পরে।

আমাদের অদৃষ্টেও জানি না কী অপেক্ষা করে আছে ওই অজ্ঞাত বনভূমির নিষিদ্ধ এলাকায়!

আরও দুর্ভোগ লেখা ছিল কপালে।

আকাশে কালচে মেঘ জমছিল সকাল থেকে। বিকেল নাগাদ ঝোড়ো হাওয়ার সঙ্গে নামল প্রবল বৃষ্টি। ঘণ্টাখানেকের মধ্যে নদী ফুলে-ফেঁপে কূল ছাপিয়ে উঠল। বাধ্য হয়ে নদীতীর ছেড়ে বনের ভিতর সরে গেলাম।

বৃষ্টির ছাঁট আর সূর্যালোকে ভালো দৃষ্টি চলে না। প্রকৃতির এই তাণ্ডবে বনের সব। পশু-পাখি নিরাপদ আশ্রয়ে আত্মগোপন করেছে। শুধু বুঝি আমরা তিনটি মানুষ বাইরে বেরিয়েছি। ওয়াটারপ্রুফ মুড়ি দিয়ে সতর্কভাবে পা ফেলছি–ছপ ছপ ছপ। সামনে মার্কো,

পিছনে মামাবাবু ও আমি। পায়ের নিচে কোনো চোরা গর্তে যে কোনো সময় তলিয়ে যেতে পারি। ফোঁস করে মাথা তুলতে পারে কোনো হিংস্র সরীসৃপ। লা-মন্টানার ট্রপিকাল অরণ্য যেন তার সমস্ত দুর্গমতা দিয়ে আমাদের বাধা দেবার চেষ্টা করছে। সুউচ্চ বৃক্ষকাণ্ডগুলিকে পাশ কাটিয়ে, ঝোঁপঝাড় সরিয়ে ধীরে ধীরে এগোই।

ক্রমে পাহাড়ের পাদদেশে এসে উপস্থিত হলাম।

সন্ধ্যা নেমেছে, দিনের সব আলোটুকু গেছে মুছে। টর্চের আলোর রেখার দুপাশ থেকে জমাট অন্ধকার যেন চেপে আসে। ঘন ঘন বিদ্যুতের ঝিলিকে আকাশ যাচ্ছে চিরে, সঙ্গে কানে তালা-ধরানো মেঘ-গর্জন।

পাহাড়ের তলায় ঘন বাঁশঝাড়। বাঁশের তীক্ষ্ণ ডগাগুলিকে সাবধানে এড়িয়ে চলি। মার্কো বলল, একটা গুহা খুঁজি, নইলে সারা রাত ভিজতে হবে।

পাহাড়ের গায়ে পিছল পাথরের ওপর দিয়ে খানিকটা উঠে সৌভাগ্যক্রমে একটা গুহা পেলাম। ভিতরে আলো ফেলতেই দুজোড়া সবুজ চোখ জ্বলজ্বল করে উঠল। অপোসাম। খটাশ জাতীয় প্রাণী। জন্তু দুটো আমাদের দেখে দাঁত খিঁচিয়ে উঠল। দুর্যোগের রাতে তারা আশ্রয় ছাড়তে চাইছে না। যা হোক টর্চের তীব্র আলোয় ভয় পেয়ে তারা বাইরে পালাল।

চট করে স্টোভ জ্বেলে কফি বানিয়ে ফেললাম। গুহার মধ্যে কয়েকটা পোড়া কাঠ পড়েছিল। কেউ আগুন জ্বেলেছিল। সেগুলো ধরিয়ে রাখলাম গুহার মুখে। যাতে বুনো জন্তু

ঢোকে। সবাই নীরব, অবসন্ন। প্রিয়জনকে হারানোর দুঃসহ আশঙ্কা ক্রমে চেপে বসছে বুকে। শুধু মার্কো মাঝে মাঝে উৎসাহ দিচ্ছিল আমায়। বলছিল, “আরে ভয় পেও না, সুনন্দকে ঠিক ফিরিয়ে আনব, দেখ। যদিও জানি, সত্যি সত্যি এমন ভরসা সেও করতে পারছিল না।

একটু পরে গুহার দেওয়ালে ঠেস দিয়ে ক্লান্তিতে ঘুমিয়ে পড়লাম।

সকালে আকাশ দিব্যি পরিষ্কার। কিন্তু সারাদিন ঘুরেও পাহাড়ি উপজাতির দর্শন পেলাম না। সন্ধে নাগাদ একটা ছোট সমতল জায়গায় বিশ্রাম নিচ্ছি, পায়ে ব্যথা, শরীর অবসন্ন। সহসা খেয়াল হল অনেকগুলি ছায়ামূর্তি আমাদের ঘিরে ধরেছে। তড়াক করে লাফিয়ে উঠে কাঠ হয়ে গেলাম। বুনো রেড-ইন্ডিয়ান! প্রত্যেকে ধনুকে তির লাগিয়ে কান অবধি ছিলা টেনে আমাদের দিকে তাক করে আছে। আস্তে আস্তে মাথার ওপর হাত তুললাম।

মার্কো দেশি ভাষায় চেঁচিয়ে বলতে লাগল, আমরা শত্রু নই বন্ধু। কিন্তু তাদের ভাবগতিকে বিন্দুমাত্র পরিবর্তন হল না। তাদের মুখ কঠোর, চোখে সন্দেহপূর্ণ দৃষ্টি। একজন এসে আমাদের বন্দুক ও পিস্তলগুলি নিয়ে নিল। অর্থাৎ আগ্নেয়াস্ত্রের মহিমা এরা

জানে। তারপর তারা আমাদের হাত-পা শক্ত করে বাঁধল দড়ি দিয়ে। নিরুপায় হয়ে মাটিতে শুয়ে পড়লাম।

কয়েকজন রেড-ইন্ডিয়ান আমাদের পকেট পরীক্ষা করতে লাগল। কিছু কিছু পছন্দসই জিনিস তারা বাজেয়াপ্ত করে এক জায়গায় জড়ো করে রাখল। বাকি জিনিস ছুঁড়ে ফেলে দিল। একজন মামাবাবুর ব্যাগ খুলেই এক চিৎকার। তার হাতে দেখি বৈজ্ঞানিক সর্বজ্ঞর ফোটোখানি।

এরপর তারা উত্তেজিতভাবে আলোচনা শুরু করল। হাতে হাতে ঘুরছে ফোটোটা। মামাবাবু বললেন, সর্বজ্ঞকে ওরা চিনতে পেরেছে। ইস, যদি কথা বলা যেত!

কিন্তু কোনো কথাবার্তা বলতে ওরা রাজি নয়।

একটু পরে একজন ভারিক্কি চেহারার লোক এসে উপস্থিত হল। তার গায়ে রঙচঙে সুতির আলখাল্লা, মাথায় পালকের মুকুট। হয়তো দলের সর্দার। সে ফোটোখানা হাতে নিয়ে দেখল। তারপর আমাদের তীক্ষ্ণ চোখে পর্যবেক্ষণ করে আবার ফিরে চলে গেল।

এইভাবে বন্দী হয়ে পড়ে রইলাম সারারাত। ইন্ডিয়ানরা আমাদের পাহারা দিতে লাগল। “কী গো বীরপুরুষেরা! লাগছে কেমন? মার্কোর চোখে হাসির ঝিলিক। তারপরই মার্কোর কণ্ঠে কেমন যেন আবেগ ফুটল,-ভাই অসিট, তোমাদের অনেক ঠাট্টা করেছি। কিন্তু সত্যি

বলছি মনে মনে তোমাদের আমি বীরপুরুষ বলে স্বীকার করেছি। তোমরা সত্যি অসাধারণ। সাহস ও ধৈর্য দেখিয়েছ। ব্রেভ ইয়াংম্যান।

তারপর একটু থেমে মুচকি হেসে বলল, হয়তো আর অভিনন্দন জানাবার সুযোগ পাব না তাই বলে রাখছি। হাত ভোলা নেই, ফলে হ্যান্ডসেক করতে পারলাম না। সরি! আর বড় দুঃখ হচ্ছে, সুনন্দর সঙ্গে বুঝি আর দেখা হল না।

মার্কোর কথায় বুঝলাম আসন্ন বিপদের গুরুত্ব জিজ্ঞেস করলাম—এরা কী করতে চায় আমাদের নিয়ে?

ঠিক বঝছি না। মনে হয় মতলব ভালো নয়। জীবনে অনেকবার মৃত্যুর মুখোমুখি হয়েছি। মরণের ফাঁদ কেটে বেরিয়েও গেছি। যদি বুঝি সত্যি এরা আমাদের হত্যা করতে চায়, তা হলে এবারও চেষ্টা করব।

কীভাবে?

হাতের বাঁধন আমি ঠিক খুলে ফেলব। তারপর পা। ওই দেখ ঢিপির ওপরে আমাদের বন্দুক আর পিস্তলগুলো। প্রহরীদের ফাঁকি দিয়ে যদি একবার ওই গুলিভরা বন্দুক বা পিস্তল হাতাতে পারি তাহলে একচোট লড়ব। অবশ্য শেষ পর্যন্ত প্রাণে বাঁচব কিনা বলা

শক্ত। এদের তিরের ফলায় থাকে মারাত্মক কুরারি বিষ। একবার রক্তে মিশলে আর রক্ষে নেই।

মামাবাবু যেন নির্বিকার। শুধু একবার মার্কোকে বললেন, এই ইন্ডিয়ানদের চেহারা আর পোশাক দেখেছ? অন্য উপজাতির থেকে আলাদা। বেশ সুশৃঙ্খল জাত।

মার্কো বলল, "হ্যাঁ। আপশোস হচ্ছে এদের ছবি তুলতে পারলাম না।

ভোরের দিকে একটু ঝিমুনি এসেছিল। অপরিচিত কণ্ঠে পরিষ্কার বাংলা কথা শুনে চমকে তাকালাম।–আরে প্রোফেসার ঘোষ আপনি!

একি, ভূত দেখছি নাকি!

সেই শীর্ণ মুখ, বড় বড় উজ্জ্বল চোখ। সেই টিয়াপাখির মতো বাঁকানো নাক, চিবুকে একগুচ্ছ দাড়ি। ফোটোতে এ-মুখ বারবার দেখে মনে গেঁথে গেছে। তাই লোকটিকে চিনতে ভুল হল না। ইনি স্বয়ং বৈজ্ঞানিক সত্যনাথ সর্বজ্ঞ।

.

০৭.

বৈজ্ঞানিক সর্বজ্ঞকে দেখে আমাদের মুখ দিয়ে কিছুক্ষণ কোনো কথা বেরোল না। তারপর মামাবাবু প্রায় চেঁচিয়ে উঠলেন, আপনি বেঁচে আছেন!

সর্বজ্ঞ বললেন, সশরীরে এবং সুস্থ দেহে। কিন্তু আপনাদের এ কী অবস্থা! সর্বজ্ঞ ইশারা করা মাত্র রেড-ইন্ডিয়ানরা আমাদের হাত-পায়ের বাঁধন খুলে দিল। মামাবাবু বললেন, আপনি এখানে কী করছেন? আপনি কি স্বেচ্ছায়–?

হ্যাঁ, আমি স্বেচ্ছায় এসেছি এখানে। বিশেষ কাজ। কিন্তু আমাকে প্রশ্ন করার আগে আমার কয়েকটা প্রশ্নের উত্তর আমি চাই।

বেশ, বলুন।

আমার এই ফোটো আপনাদের হাতে এল কী করে?

রূপা আমায় দিয়েছে।

ও, রূপা বুঝি আপনাকে আমার খোঁজ করতে বলেছে?

হ্যাঁ।

www.bengaliebook.com

মেয়েটাকে ইঙ্গিত দেওয়াই আমার ভুল হয়ে গেছে। আচ্ছা প্রোফেসর ঘোষ, আমি যে এখানে আছি এ-সন্ধান আপনি পেলেন কীভাবে?

মামাবাবু, ভিক্টরের তোলা ফোটোয় সর্বজ্ঞর টুপি ও টাই-এর কথা, র‍্যাপসোদের মুখে এই পাহাড়ে সর্বজ্ঞর আগমনের খোঁজ পাওয়া ইত্যাদি সমস্ত বিবরণ অল্প কথায় জানালেন।

বৈজ্ঞানিক সর্বজ্ঞ দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, এত আঁটঘাট বেঁধে কাজে নেমেও দেখছি কতগুলো খুঁত থেকে গেছে।

মামাবাবু বলে উঠলেন, ডক্টর সর্বজ্ঞ, একটা কথা। আমার ভাগনে সুনন্দকে এই ইন্ডিয়ানরা ধরে এনেছে, দয়া করে ওদের জিজ্ঞেস করুন সে কোথায়, কেমন আছে?

সেকি! সর্বজ্ঞ তৎক্ষণাৎ ইন্ডিয়ানদের সঙ্গে কথা বলতে শুরু করলেন। একটু পরে ফিরে মামাবাবুকে বললেন, বেঁচে আছে আপনার ভাগনে। ভালোই আছে। যদিও বন্দী। আমি তাকে এক্ষুনি এখানে আনতে বলেছি।

কয়েকজন ইন্ডিয়ান দেখলাম চলে গেল পাহাড়ের পথে। আঃ! আমাদের মনের ওপর। থেকে কী ভীষণ যে ভার নেমে গেল!

মামাবাবু বললেন, ডক্টর সর্বজ্ঞ, আপনার এই অজ্ঞাতবাসের কারণ জানতে পারি কি?

সর্বজ্ঞ বললেন, সবই আমি বলব, কিন্তু এখন এখানে নয়। আপনাদের আমার সঙ্গে যেতে হবে একটা জায়গায়। কিন্তু আপনাদের প্রতিজ্ঞা করতে হবে আমি যতদিন না নিজে থেকে আত্মপ্রকাশ করি, ততদিন আমার এই অজ্ঞাতবাসের বা এখানে যা দেখবেন এবং যা শুনবেন তার কণামাত্র খবর কাউকে জানাতে পারবেন না। মনে রাখবেন তাতে আমার গবেষণার ক্ষতি হবে। এব্যাপারে আপনি সম্মত কিনা বলুন।

রাজি, মামাবাবু সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দেন, আপনি সুস্থ দেহে বর্তমান এইটুকু জেনেই আমি সন্তুষ্ট। আপনার সব খবর আমরা সম্পূর্ণ গোপন রাখব। মার্কো, আশা করি আমার কথায় আপনি সায় দেবেন?

আলবাৎ, বলল মার্কো। আমিও মামাবাবুকে সমর্থন জানালাম।

প্রায় ঘণ্টাখানেক অপেক্ষা করলাম। সর্বজ্ঞ মামাবাবুর কাছে কিছু পরিচিত বিজ্ঞানীর খবরাখবর নিতে লাগলেন। সহসা বনের ভিতর কাদের পায়ের শব্দ? উদগ্রীব হয়ে তাকিয়ে থাকি। পাথরের আড়াল থেকে বেরিয়ে এল কয়েকজন ইন্ডিয়ান এবং তাদের মাঝে সুনন্দ।

আমি লাফ দিয়ে গিয়ে সুনন্দকে জড়িয়ে ধরলাম। মামাবাবু তার গায়ে হাত বুলিয়ে বললেন, অত্যাচার করেনি তো?

না। সুনন্দ উত্তর দেয়, তবে বড় জোরে বেঁধে রেখেছিল, হাতে-পায়ে কালশিরা পড়ে গেছে।

তোকে নিয়ে কী করত ওরা? আমি জানতে চাই।

সুনন্দ ক্ষীণ হেসে বলল, নির্ঘাত মৃত্যুদণ্ড দিত। তবে কী উপায়ে মারবে বোধহয় ঠিক করতে পারছিল না। মনে হচ্ছিল, তাই নিয়ে বেজায় তর্কাতর্কি চলছে।

মার্কো হ্যান্ডসেক করে বলল, "ব্রাদার সুনন্দ, আমাদের ফাঁকি দিয়ে একা বেড়াতে যাওয়া তোমার কিন্তু উচিত হয়নি। যাক, আপাতত এককাপ কফি খাবে নাকি?

"না না, শুধু কফি নয়, সুনন্দ কাতর স্বরে বলে ওঠে, কিছু খাবার দাও। কিচ্ছু খাইনি। কী একটা খেতে দিয়েছিল, খেতে পারিনি। বাপরে কী ঝাল!

সুনন্দর সঙ্গে বৈজ্ঞানিক সর্বজ্ঞর আলাপ করিয়ে দেওয়া হল। সুনন্দ অনেক ধন্যবাদ জানাল তাকে।

গরম কফি খেয়ে আমরা বৈজ্ঞানিক সর্বজ্ঞর সঙ্গে রওনা দিলাম।

পাহাড়ের অনেক চড়াই উৎরাই পেরিয়ে প্রায় ঘণ্টা তিন চলার পর দুই পাহাড়ের মাঝে এক সমতলভূমিতে পা দিয়ে আমরা থমকে দাঁড়ালাম।

আশ্চর্য দৃশ্য। ছোট মালভূমিতে এক প্রস্তরনগরীর ধ্বংসাবশেষ। প্রাসাদ, প্রাচীর, বেদি, সোপানশ্রেণি মিলিয়ে প্রাচীন নগরীর কঙ্কালকে ঢেকে ফেলেছে আগাছা, লতা, আর বড় বড় গাছ। মামাবাবু বললেন, এ যে আর এক মাচুপিচু। অদ্ভুত ব্যাপার!

বৈজ্ঞানিক সর্বজ্ঞ বললেন, ঠিক ধরেছেন। মাচুপিছু থেকে যারা পালিয়ে এসেছিল খুব সম্ভব তারাই এ নগর তৈরি করে। মাচুপিচুর শেষদিনের ইতিহাস মনে করুন। ইংকা রাজা টুপাক আমারু স্প্যানিয়ার্ডদের তাড়া খেয়ে মাচুপিচু ত্যাগ করে পালাল। কিন্তু কিছু দূর এসে সে ধরা পড়ল। ধরা পড়েছিল বলা উচিত নয়, সে আত্মসমর্পণ করেছিল। স্প্যানিয়ার্ডরা তাকে কুজকোয় নিয়ে গিয়ে হত্যা করল। কিন্তু রাজার সঙ্গীরা সবাই নিশ্চয় বিদেশিদের হাতে আত্মসমর্পণ করতে রাজি হয়নি। তারা কেউ কেউ দুর্ভেদ্য আমাজনের বনে পালিয়ে যায়। আমার বিশ্বাস তারাই এখানে এসে আশ্রয় নিয়েছিল। গড়ে তুলেছিল এই নগর। জানি না কতকাল তারা এখানে বাস করেছিল? কীভাবে তারা লুপ্ত হয়ে গেল?

হঠাৎ সর্বজ্ঞ সুর পাল্টালেন।–দেখুন প্রোফেসর ঘোষ, একটা ইংকা ধ্বংসাবশেষ নিয়ে রিসার্চ করতে আমি এখানে পড়ে নেই। আমার উদ্দেশ্য অন্য। চলুন পাহাড়ের ওপাশে। সর্বজ্ঞ আমাদের সঙ্গে নিয়ে চললেন।

–ওই দেখুন, ওগুলো ছিল প্রাচীন ইংকা চাযের ক্ষেত।

কিছু দূরে পাহাড়ের গায়ে অনেকগুলো চাতাল কাটা রয়েছে। সর্বজ্ঞ সেই দিকে হাত বাড়িয়ে দেখালেন। চাতালে নানারকম গাছ ও ঝোঁপ জন্মেছে। সর্বজ্ঞ বললেন, এই ক্ষেত ছাড়াও পাহাড়ের পাদদেশে জঙ্গল সাফ করে ইংকারা কিছু ক্ষেত বানিয়েছিল। বাগান। করেছিল। এখন অবশ্য সব জঙ্গলে ঢাকা পড়ে গেছে। আমি এদের সেইসব ক্ষেত এবং বাগান খোঁজ করে আট-দশ রকম সম্পূর্ণ নতুন ধরনের ফল-মূল-তরকারি পেয়েছি।

প্রথমবার এসেই আমি ইন্ডিয়ানদের নানারকম নতুন ফল-মূল খেতে দেখি। তাদের প্রশ্ন করে আবিষ্কার করি এই ইংকা ক্ষেত এবং বাগানের সন্ধান। জানেন তো ইংকা জাতি ছিল আশ্চর্য প্রতিভাধর কৃষিবিজ্ঞানী। আধুনিককালে আমাদের প্রিয় অনেক ফল-মূল-শস্যই তাদের আবিষ্কারের দান। পেরুর পাহাড়-জঙ্গল থেকে খুঁজে এনে কত যে ফল-মূল-শস্য আর গাছপালাকে তারা মানুষের খাদ্য বা অন্য ব্যবহারে লাগিয়েছিল!

–কী কী? আমি কৌতূহল চাপতে পারি না। ব্যাপারটা খানিক জানলেও ভালো করে জানতাম না আমি।

সুনন্দ ভুরু কুঁচকিয়ে কড়া চোখে তাকায় আমার দিকে। ভাবখানা যেন, এই অতি সামান্য জ্ঞানটুকু নেই তোর! অযথা সময় নষ্ট করছিস।

বৈজ্ঞানিক সর্বজ্ঞ কিন্তু বিরক্ত হন না। হেসে বলেন, শুধু আপনি নন, অনেকেই ব্যাপারটা তেমন বিশদে জানে না। সব কটার নাম মনে পড়ছে না এখন। কয়েক কয়েকটা বলছি। এই যেমন– আল, টমেটো, ভুট্টা, আনারস, পেয়ারা, তামাক, সিঙ্কোনা, রবার, কাকাও মানে যার থেকে কোকো অর্থাৎ চকোলেট হয়...

মামাবার থামিয়ে দেন সর্বজ্ঞকে। বলেন, মনে হচ্ছে এখানেও ইংকারা তেমন নতুন কিছু আবিষ্কার করেছিল?

হ্যাঁ তাই, জানান সর্বজ্ঞ, পলাতক ইংকারা এই সুদূরে একরকম বন্দী জীবনযাপন করত। গবেষণার নেশায় তখন তারা আমাজনের বন থেকে নানারকম নতুন ফলমূল উদ্ভিদ সংগ্রহ করে সেগুলি মানুষের ব্যবহারের উপযোগী করেছিল।

এখানকার ইন্ডিয়ানরা বঝি ইংকাদের আবিষ্কার করা ফল-মূল খায়? আমি প্রশ্ন কার।

হ্যাঁ খায়, তবে সব নয়। কয়েকটা মাত্র। সেগুলো তারা চাষও করে। বাকি আবিষ্কারগুলি প্রায় জংলি হয়ে গেছে। তবে ইন্ডিয়ানরা জানে কোন্ কোন্টা খাওয়া যায়। আমি এদের

সাহায্যে সেইসব গাছপালা উদ্ধার করেছি। তাদের চারা তৈরি করেছি। আশা। করছি আগামী কয়েক বছরের মধ্যে পৃথিবীর লোক অনেক নতুন ফল-মূলের স্বাদ গ্রহণ করতে পারবে। তবে আমার সবচেয়ে মূল্যবান আবিষ্কার হবে কতকগুলি ভেষজ উদ্ভিদ। পাহাড়ি ইন্ডিয়ানরা ইংকাদের কাছে চিকিৎসার জন্য অনেক গাছ-গাছড়ার ব্যবহার শিখেছে, আর তাদের কাছ থেকে জেনেছি আমি। সেইসব উদ্ভিদ থেকে অনেক দুরারোগ্য রোগের ওষুধ তৈরি হবে ভবিষ্যতে।...এই হল আমার গবেষণা এবং এই জন্যই আমার অজ্ঞাতবাস।

এর জন্য অজ্ঞাতবাসের কী প্রয়োজন? মার্কো একটু অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করে।

কারণ জানিয়ে শুনিয়ে এখানে বেশিদিন থাকলে লোকে সন্দেহ করত। খবরটা রটে যেত। তখন দলে দলে বৈজ্ঞানিক এসে হাজির হত। এবং আমার আবিষ্কারে তারা ভাগ বসাত। এটা আমার পছন্দ নয়। এ-জায়গা আমি তন্ন তন্ন করে খুঁজব, তারপর আমার আবিষ্কার সমেত আত্মপ্রকাশ করব। বৈজ্ঞানিক গর্বিত ভঙ্গিতে তাকালেন।

দুর্ঘটনার ব্যাপারটা তাহলে সাজানো? সুনন্দ জিজ্ঞেস করল।

“নিশ্চয়। প্রথমবার এখানে এসে দেখে শুনে ম্যালডোনাডায় ফিরে গেলাম। তারপর প্ল্যান করে আবার অভিযানে বের হলাম। পথে উধাও হলাম লোককে ধোঁকা দিয়ে। কিন্তু তাতেই বা সফল হলাম কই? এই তো ধরা পড়ে গেছি। বৈজ্ঞানিক সর্বজ্ঞ নিজের ওপর রাগ করে ভুরু কোঁচকালেন।

ফেরার পথে সর্বজ্ঞ দেখালেন, এই গাছ চেনেন? কোকা। যার পাতা থেকে কোকেন হয়। ইংকারা এনার্জি বাড়াতে এর পাতা চিবুত। এখানে ইন্ডিয়ানদেরও দেখছি সেই অভ্যেস।

আর একরকম গাছ দেখালেন সর্বজ্ঞ।–এই নগরের নির্মাতারা যে মাচুপিচু থেকে এসেছিল তার প্রমাণ এই হুলিকা গাছ। জানেন নিশ্চয় মাচুপিচুর আসল নাম ভিলকাপাম্পা। ভিলকাঁপা শব্দের অর্থ যেখানে হুলিকা গাছ জন্মায়। হুলিকা ফলের বীচি গুঁড়ো কত ইংকারা নস্যি নিত এবং তার ফলে নেশা হত। আফিং খেলে যেমন হয়। মাচুপিচু পাহাড়ে এই গাছ আছে। নিশ্চয় ইংকারা এই গাছ সঙ্গে এনেছিল। কারণ আমাজনের জঙ্গলে আর কোথাও হুলিকা গাছ নেই।

পাহাড়ের গায়ে বৈজ্ঞানিক সর্বজ্ঞর ছোট কাঠের বাংলো। সামনে টুকরো টুকরো বাগান করা হয়েছে। একজন দেশি অনুচর থাকে তার সঙ্গে। এই লোকটিই সর্বজ্ঞর সঙ্গে এসেছিল।

সর্বজ্ঞ জানালেন, একরকম শাক পেয়েছি। মোটা ডঁটা। খেতে খুব মিষ্টি। প্রচুর কার্বোহাইড্রেড আছে। নিংড়ে অনেক চিনি পাওয়া যায়। এই শাক আখের চেয়ে সহজে জন্মায়, তাড়াতাড়ি বাড়ে।

এমনি আরও ইংকাদের আবিষ্কৃত কিছু উদ্ভিদের বর্ণনা দিলেন তিনি। তার ল্যাবরেটরি দেখালেন। দেখলাম ভদ্রলোক অনেক যন্ত্রপাতি সঙ্গে নিয়ে এসেছেন।

দুপুরবেলা মার্কো ইংকা ধ্বংসাবশেষের ছবি তুলতে চলল। আমি, সুনন্দ আর মামাবাবুও সঙ্গে গেলাম। সর্বজ্ঞ কী একটা কাজ করছিলেন। বললেন, "আপনারা যান, আমি পরে আসছি। সাবধানে চলাফেরা করবেন, খুব সাপ আছে ওখানে।

ঘুরে ঘুরে দেখছি সেই মৃত নগরী, হঠাৎ পাহাড়ের গা বেয়ে একজনকে নেমে আসতে দেখে আমরা স্তম্ভিত হয়ে গেলাম।

–আগন্তুক, ডাক্তার জর্জ কেন্ট।

কেন্ট হাঁক দিলেন, হ্যালো প্রোফেসর? তিনি হাসিমুখে এগিয়ে এসে আমাদের সঙ্গে হ্যান্ডসেক করতে করতে বললেন।–উঃ কী যে দুশ্চিন্তা হচ্ছিল। পথে যদি বিপদে পড়েন!

মার্কো বলল, ডাক্তার, আপনি বুঝি আমাদের ফলো করেছেন?

বাধ্য হয়ে। কারণ আপনারা চলে যাবার পর ভেবে ঠিক করলাম, আপনারা নিশ্চয় স্যায়ান্টিস্ট সর্বজ্ঞর খোঁজে বেরিয়েছেন। তাই আপনাদের পিছনে পিছনে রওনা দিলাম। কিন্তু একটা উপজাতি গ্রামে কদিন আটকে পড়ে গেলাম। সেখানে ইয়োলো ফিভার

লেগেছে। লোক মরছে। বেচারাদের ছেড়ে আসি কী করে? নইলে আগেই আপনাদের ধরে ফেলতাম। যাক এখন নিশ্চিন্ত।

বঝলাম কেন্ট যখন এখানে এসে পড়েছেন, তখন তার দৃষ্টি থেকে সর্বজ্ঞকে আর লুকানো যাবে না। হয়তো ইতিমধ্যেই ইন্ডিয়ানদের কাছ থেকে সর্বজ্ঞর হদিসও জেনে ফেলেছেন।

আমি দু-পা এগিয়ে গেলাম। ম্যালডোনাডায় কেন্ট আমাকে যে অপমান করেছিলেন তার জ্বালা আমি ভুলিনি। ভারি মোলায়েম কণ্ঠে বিদ্রূপ মিশিয়ে বললাম, জানেন ডক্টর কেন্ট, আমরা বৈজ্ঞানিক সর্বজ্ঞকে আবিষ্কার করে ফেলেছি, একবারে সশরীরে এবং সুস্থ দেহে।

কেন্ট কেমন থমকে গেলেন। বললেন, "ওঃ, তাই নাকি! ভেরি গুড, ভেরি গুড়।

সুনন্দ ফট করে বলল, বড় হতাশ হলেন তাই না ডাক্তার?

ডাক্তার কেন্ট ভারি অবাক মুখ করে বললেন, হতাশ? আমি? কেন?

কারণ আপনি খুব আশায় ছিলেন সর্বজ্ঞ আর ফিরবেন না। ভেবেছিলেন দুর্ঘটনায় নদীতে ডুবে নির্ঘাত অক্কা পেয়েছেন। আহা, ব্যাপারটা সত্যি হলে আপনার কত সুবিধে হত।

হাঃ হাঃ হাঃ...। একটা প্রচণ্ড হাসির গমকে আমরা চমকে পিছনে ফিরলাম। হাসছেন বৈজ্ঞানিক সর্বজ্ঞ। কখন তিনি আমাদের পিছনে এসে দাঁড়িয়েছেন টের পাইনি। আমরা থতমত খেয়ে চেয়ে থাকি। এই অট্টহাসির কারণ ধরতে পারি না। কোনো রকমে হাসি থামিয়ে সর্বজ্ঞ বললেন, "আরে, আপনারা মস্ত ভুল করেছেন। ডাক্তার আমার সব খবর জানে। ওর সঙ্গে প্ল্যান করেই তো এখানে এসেছি। আর ওই তো আমাকে এই পাহাড়ে নিয়ে আসে।

অ্যাঁ! আমরা অপ্রস্তুত হয়ে মাথা চুলকাই।

সর্বজ্ঞ বলে চলেন, কেন্টের সঙ্গে এই পাহাড়ি ইন্ডিয়ানদের ভাব হয়। হিথ নদীর তারে সাপের কামড়ে মৃতপ্রায় এই উপজাতির একজনকে চিকিৎসা করে কেন্ট বাঁচিয়ে তোলে। তারপর এদের গ্রামে আসত মাঝে মাঝে। ডাক্তারকে এরা খুব শ্রদ্ধা করে। আমার সঙ্গে ওর হঠাৎ দেখা হয় হিথ নদীতে। আমাদের আগে থেকেই বন্ধুত্ব ছিল। তখন ডাক্তার ফিরছিল এই পাহাড় থেকে। সেইবারেই সে আবিষ্কার করেছে এই ইংকা নগর। খুব উত্তেজিত। আমায় বলল সব। আমি তক্ষুনি ডাক্তারকে নিয়ে পাহাড়ে এলাম ধ্বংসাবশেষ দেখতে। ডাক্তার না থাকলে অবশ্য আমি এই পাহাড়ে ঢুকতেই পারতাম না।

কেন? আমি জানতে চাই।

কারণ এই ইন্ডিয়ানরা বিদেশিদের এখানে আসতে দিতে চায় না। কিছু স্প্যানিয়ার্ড নাকি একবার অযথা গুলি চালিয়ে ওদের অনেক লোককে মেরে ফেলে। বিদেশিদের ওপর তাই এদের ভীষণ রাগ। অবশ্য যাদের বন্ধু বলে মনে করে তাদের কথা আলাদা।

এই ইন্ডিয়ানরা কারা? এদের সঙ্গে কি ইংকাদের কোনো সম্পর্ক ছিল? এতক্ষণে মামাবাবু কথা বললেন।

বোধহয় ছিল। বললেন সর্বজ্ঞ। মনে হয় এই উপজাতি ছিল সুসভ্য ইংকাদের অনুগত রক্ষী। ইংকাদের সঙ্গে এদের মেলামেশাও হয়েছিল কারণ এদের মধ্যে অনেক প্রাচীন ইংকা আচার-ব্যবহার আমি লক্ষ করেছি। জানেন, এরা প্রতিদিন ভোরে প্রাচীন ইংকাদের মতো সূর্য দেবতার বন্দনা করে–ও ভিরাকোচা (সূর্যদেব), ও পাচাকামাক (আলোর দেবতা)।

মামাবাবু ডাক্তার কেন্টের সামনে গিয়ে দাঁড়িয়ে, তার হাত ধরে বিনীত স্বরে বললেন। “ডক্টর আপনার কাছে আমি মাফ চাইছি। আপনাকে আমরা অন্যায়ভাবে সন্দেহ করেছিলাম।

“কেন? কীজন্যে সন্দেহ? ডাক্তার রীতিমতো অবাক হয়ে বলেন।

মামাবাবু এবার সর্বজ্ঞকে উদ্দেশ্য করে বললেন, আমরা প্রথমে ভেবেছিলাম আw নিখোঁজ হওয়ার জন্য ডাক্তারই দায়ী। আপনাকে উনি কোনো কায়দায় পৃথিবী থেকে সরিয়ে দিয়েছেন। পরে এখানে এসে ভাবলাম ডাক্তার হত্যাকারী নয়, কিন্তু আর পাঁচজনের মতো বিশ্বাস করেছেন আপনি দুর্ঘটনায় মারা পড়েছেন।

কিন্তু সায়ান্টিস্ট মারা গেলে আমার লাভ? কারণটা দয়া করে বলবেন কি? কেন্ট অধৈর্যভাবে বলে ওঠেন।

লাভ সেই মহামূল্যবান ব্লু-অর্কিড। আমরা সন্দেহ করেছিলাম সর্বজ্ঞর অবর্তমানে তার আবিষ্কার ব্লু-অর্কিড আপনি অধিকার করতে চান।

কেন্ট আঁতকে উঠলেন, মাই গড, ব্লু-অর্কিডটা আপনার চোখে পড়েছে? ঠিক এই ভয়েই আমি ওটা লুকিয়ে রেখেছিলাম। পাছে লোকে আমায় সন্দেহ করে?

ব্লু-অর্কিড সম্বন্ধে আপনি জানলেন কী করে? সর্বজ্ঞ মামাবাবুকে প্রশ্ন করলেন।

রূপার চিঠি পড়ে। মামাবাবু জবাব দিলেন।

ওঃ, মনে পড়েছে। বড় কাঁচা কাজ করেছি আমি। মেয়েটা অর্কিড ভালোবাসে, তাই ভাবলাম খুশি হবে। তা ডক্টর, আপনার অত লুকোচুরির দরকার কী ছিল?

কেন্ট বললেন, কারণ আমি চাইছিলাম, আপনি আত্মপ্রকাশ করার পর লোকে এই অর্কিড আবিষ্কারের খবর জানুক। নইলে আপনার এত বড় আবিষ্কার আমার হেফাজতে রেখে আপনি নিখোঁজ হয়েছেন জানলে লোকে স্বাভাবিকভাবে আমায় সন্দেহ করত, আমাকে জেরা করত। ফলে আমি বাধ্য হতাম আপনার অজ্ঞাতবাসের কাহিনি বলে দিতে।

তা বেশ, ওটা আপনার আবিষ্কার বলে দিলেই তো ল্যাঠা চুকে যেত। আমি তো বারবার বলেছি ও ফুলের প্রকৃত আবিষ্কারক হওয়া উচিত আপনি, আমি নয়।

ডাক্তার বললেন, "তা হয় না। কেন হয় না?ওই অর্কিড পাওয়া গেছে এই পাহাড়ে। এ-পাহাড়ে আপনি আমায় নিয়ে এলেন। দৈবাৎ আমার চোখে পড়ে গেল ফুলটা। নইলে ও-ফুল আপনি পরে ঠিক আবিষ্কার করতেন। আপনি নিয়ে না এলে এখানে আমার আসার কোনো সম্ভাবনা ছিল না। সুতরাং এ-ফুলের প্রকৃত আবিষ্কারক ডক্টর জর্জ কেন্ট।

ডাক্তার দৃঢ়ভাবে মাথা নাড়লেন।–না-না।

সর্বজ্ঞ খিঁচিয়ে উঠলেন, জানেন ঘোষ, এই ডাক্তারের সব ভালো। শুধু বড় এঁড়ে তর্কের বাতিক। সোজা যুক্তি মাথায় ঢোকে না। ঠিক আছে, প্রোফেসর ঘোষ আপনি পণ্ডিত

ব্যক্তি। তৃতীয় পক্ষ। আপনি স্থির করে দিন এই ব্লু-অর্কিডের আবিষ্কারকর্তা কে হবে? আমরা তা মেনে নেব।

মামাবাবু সর্বজ্ঞকে বললেন, আপনি এই ফুল প্রথম পেয়েছিলেন?

হ্যাঁ। দৈবাৎ।

তারপর কী করলেন?

কয়েকবার গন্ধ শুঁকে ফুলটা আমার জামার পকেটে রেখেছিলাম। ভেবেছিলাম ডাক্তারকে উপহার দেব। ও অর্কিড ভালোবাসে।

তারপর?

ডাক্তার তো ফুলটা দেখেই উত্তেজনায় লাফিয়ে উঠল। এ-ফুল যে এত মূল্যবান এবং নতুন ধরনের তা আমি ধারণাও করিনি। ডাক্তারের সঙ্গে অনেক খুঁজে ফের বের করলাম। ওই অর্কিডের গাছ।

মামাবাবু বললেন, যদি ডাক্তার না থাকত তাহলে ওই ফুল নিয়ে কী করতেন?

নির্ঘাত ফেলে দিতাম। শৌখিন ফুল বা অর্কিড নিয়ে আমি কোনোকালে মাথা ঘামাই । তাছাড়া আমার মাথায় তখন ঘুরছে অন্য এক বিরাট আবিষ্কারের চিন্তা।

মামাবাবু বললেন, “আমার মতে এই নীল অর্কিডের আবিষ্কারক হবেন আপনারা দুজনে একসঙ্গে। জয়েন্ট ডিসকভারার।

সর্বজ্ঞ ভুরু কুঁচকে বললেন, বেশ, ডাক্তারের সঙ্গে যদি আমার নামটা জুড়ে দিতে চান, তাই হোক। হ্যাঁ, ডাক্তার রাজি তো? এ-শর্তে ও রাজি না হলে আমি কিন্তু সত্যি চটে যাব।

ডাক্তারের মুখ লাল। আবেগরুদ্ধ স্বরে বললেন, উত্তম। আপনাদের বিচার আমি মেনে নিলাম। এত বড় আবিষ্কারের ভাগ দিলেন বলে আমি কৃতজ্ঞ। ধন্যবাদ।

সর্বজ্ঞ তেড়ে উঠলেন, “বিনয় দেখানো হচ্ছে? বটে! আমার আবিষ্কারে যখন সবাই থ মেরে যাবে, তখন সারা জগৎকে জানিয়ে আমিও ধন্যবাদ দেব ডাক্তার কেন্টকে। মনে থাকে যেন।

মার্কো বলে উঠল, ঝগড়া নয়। ওং শান্তি! শান্তি! দুজনে এবার হাত মেলান।

ডাক্তার ও সর্বজ্ঞ পরস্পরের হাত চেপে ধরলেন। অমনি ক্যামেরার ক্লিক।

সর্বজ্ঞ রেগে বললেন, ছবি তুললেন যে?

মার্কো বলল, ভয় নেই। এ-ফোটো ছাপা হবে আপনার আত্মপ্রকাশের পর।

সর্বজ্ঞ মামাবাবুকে বললেন, রূপাকে বলবেন, তার বাবা তোফা আছে। বছরখানেক পরে ফিরবে। তবে এ-খবর যেন সে গোপন রাখে। ব্যস। কোথায় আছি, কী করছি বলার দরকার নেই।

গল্পের ফাঁকে ডাক্তার সুনন্দকে বললেন, শুনলাম তোমরা দুই ইয়াংম্যান নাকি ভারি ওস্তাদ। র‍্যাপসো বলছিল। ওদের আচ্ছা জব্দ করেছ।

সুনন্দ বলল, সেই দুই বিদ্রোহী সৈনিক? আপনার সঙ্গে ওদের দেখা হয়েছে বুঝি?

হ্যাঁ, ওদের আস্তানায় গিয়ে আমিই দেখা করেছি। একটা জরুরি খবর জানাতে।

কী খবর?

বললাম যে জেনারেল ফ্রাঙ্কো এবং তার বিদ্রোহী সৈন্যদের বলিভিয়া সরকার ক্ষমা করেছে। শুনে ওরা খুশি হয়ে দেশে রওনা দিল।

দুদিন বিশ্রাম নিলাম। সঙ্গে ডাক্তার রয়েছে, সুতরাং ফেরার ব্যাপারে আমরা নির্ভাবনা। ডাক্তারের দুই অনুচর নৌকো নিয়ে অপেক্ষা করছে নদীতে। তারা আমাদের নৌকো মেরামত করে দেবে।

হিথ নদীর সঙ্গমের কাছে পৌঁছেছি। দেখি একটা ক্যানুর ওপর দাঁড়িয়ে একজন আমাদের দিকে তাকিয়ে আছে। সেই রহস্যময় পেড্রো লোপেজ।

আমি বললাম, ডাক্তার কেন্ট, এই লোকটি আমাদের অনুসরণ করছিল।

বুঝেছি। ডাক্তার মাথা নাড়েন। তারপর চেঁচিয়ে ডাকেন, ওহে পেড্রো, কেমন আছ? নাঃ, তুমি আবার ভুল করেছ। এরা গুপ্তধনের খোঁজে যায়নি। পাহাড়ি ইন্ডিয়ান গ্রামে ফোটো তুলতে গিয়েছিল। খুব বিপদে পড়েছিল। তুমি যেও না ওদিকে।

পেড্রো আমতা আমতা করে বলল, তবে যে ওরা বলল?

কী বলল? কারা?

লঞ্চের খালাসিরা। এরা নাকি একটা প্রাচীন নগর আবিষ্কার করতে যাচ্ছে। একটা ম্যাপ পেয়েছে।

ঠাট্টা করেছে। বুঝতে পারোনি। বললেন ডাক্তার।

অ্যাঁ? ঠাট্টা! আমার সঙ্গে? দাঁড়াও, হতচ্ছাড়া শয়তানগুলোকে দেখাচ্ছি মজা। পেড়ো ঘুঁষি পাকাল। তারপর ধপ্ করে নৌকোর মধ্যে বসে পড়ল।

আমরা জিজ্ঞাসা করলাম, কী ব্যাপার ডক্টর?

ডাক্তার হেসে বললেন, সে এক বিচিত্র কাহিনি। প্রায় দেড়শো বছর আগে পেড্রোর এক পূর্বপুরুষ এই অঞ্চলের জঙ্গলে পাহাড়ের ওপর নাকি এক নগর আবিষ্কার করে। সেখানে ইংকাদের বাস। তাদের অঢেল সোনাদানা। পেড্রোর পূর্বপুরুষ লুকিয়ে দেখেছিল তাদের। কিন্তু সোনা আনতে পারেনি। জংলি ইন্ডিয়ানদের তাড়া খেয়ে কোনোরকমে পালিয়ে বাঁচে। কাউকে বলেনি সে-খবর। শুধু তার ডাইরিতে লিখে রেখেছিল সব কথা। তার কিছু পরে সেই পূর্বপুরুষ এক দুর্ঘটনায় মারা যায়। এতকাল পরে তার ডাইরি পেয়েছে পেড্রো। ডাইরির পাতা ছেঁড়া, লেখা ধেবড়ে গেছে। তাতে ইংকা নগরীর কোনো ঠিকানা পাওয়া যায়নি। তবু পেড্রো ক্ষেপে উঠেছে। সে আবিষ্কার করবে সেই নগর এবং ইংকাদের ধনরত্ন। পেরুর মন্টানা প্রদেশের কত পাহাড়-জঙ্গল যে সে চষে বেড়িয়েছে তার ইয়ত্তা নেই। লোকে ওকে খ্যাপায়, তাতে ওর আরও জেদ বাড়ে।

একটুক্ষণ চুপ করে থেকে ডাক্তার বললেন, এবার কিন্তু পেড্রো ঠিক লোককেই ফলো করেছিল। অবশ্য জানি না, ওই পাহাড়ে খুঁজলে ইংকাদের ট্রেজার সত্যি পাওয়া যাবে কিনা?

ম্যালডোনাডোয় ডাক্তারের বাড়িতে তিনদিন থাকলাম। তারপর গেলাম কুজকো।

কুজকোয় বিদায় নিল মার্কো। এয়ারপোর্টে সে হাত নেড়ে চিৎকার করে বলল–আদিওস (বিদায়) প্রোফেসর। আদিওস অসিট। আদিওস সুনন্দ। সামনের বছর ইন্ডিয়ায় যাচ্ছি, তখন দেখা হবে।

ঠিক তের মাস পরে একদিন সংবাদপত্রের পাতায় চোখ আটকে গেল। দেখলাম বড় বড় হরফে ছাপা–নিখোঁজ বৈজ্ঞানিক সত্যনাথ সর্বজ্ঞর বিস্ময়কর প্রত্যাবর্তন।